বাংলা লোকনাট্য
আধুনিক নাট্যমঞ্চ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

B/D
168

রমাকান্ত দাস
অর্নিবাণ দত্ত

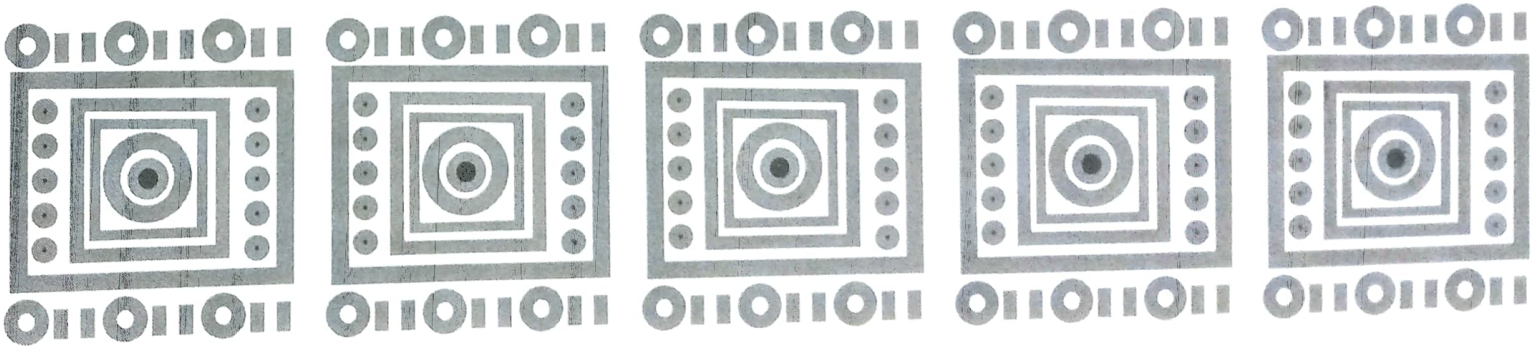

বাংলা লোকনাট্য
আধুনিক নাট্যমঞ্চ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

Accession No. 19681
Date 7/5/24
Call No. BD/M/891.443/DAS
Radhamadhab College, Lib. Silchar - 6

রমাকান্ত দাস
বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়

অনির্বাণ দত্ত
বাংলা বিভাগ, নিলামবাজার কলেজ

Bipin Chandra Memorial Library
ESTD.- 1971
SILCHAR
Radhamadhab College

R. M. COLLEGE LIBRARY SIL.-6
7D
Computerised

ক্রি

ক্রিয়েটিভ পাবলিকেশন
৩৯এ, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

"Bangla Lokanatya, Adhunik Natyamancha O Anyanya Prasanga."
– *by Dr. Ramakanta Das & Dr. Anirvana Datta.*

বাংলা লোকনাট্য আধুনিক নাট্যমঞ্চ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
রমাকান্ত দাস ও অনির্বাণ দত্ত

Accession No. 19681
Date 7/5/24
Call No. B/D/169/891.443/DAS
Radhamadhab College, Lib. Silchar - 6

গ্রন্থস্বত্ব : লেখকদ্বয়
© Authors

প্রকাশক : ক্রিয়েটিভ পাবলিকেশন

First Publication : Febuary, 2022
at International Book Fair in Kolkata

ISBN- 978-93-5437-469-2

বর্ণস্থাপন : নাইস্‌টি গ্রাফিক্স, শিলচর

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ : ক্রিয়েটিভ পাবলিকেশন

মূল্য : টাকা ৩০০/- (তিনশত টাকা)

R. M. COLLEGE LIBRARY SIL - 6
Computerised

Bipin Chandra Memorial Library
ESTD.- 1971
SILCHAR
Radhamadhab College

No part or whole of this publication may be reproduced or transmitted or utilised in any form or by any means without prior permission of the authors in writing.

Accession No. 19681
Date 7/5/24
Call No. B/D/169/891.443/DAS
Radhamadhab College, Lib. Silchar - 6

অধ্যাপক উষারঞ্জন ভট্টাচার্য
অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য
অধ্যাপক বেলা দাস
অধ্যাপক বিশ্বতোষ চৌধুরী
শ্রদ্ধাভাজনেষু

R. M. COLLEGE LIBRARY SIL - 6
Computerised

Bipin Chandra Memorial Library
ESTD.- 1971
SILCHAR
Radhamadhab College

Accession No. 19681
Date 7/5/24
Call No.
Radhamadhab College, Lib. Silchar - 6

সূ চি প ত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
• নান্দীমুখ	৭
• অভিনয় : ধরন ও প্রকারভেদ	৯
• লোকনাট্য : বাংলার প্রাচীন নাট্যধারা	১৪
• কথকতা : প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যিক পরম্পরা	২২
• বাংলার লুপ্তপ্রায় লোকনাট্য : ঘাটু	২৬
• আলকাপ : রূপে রূপান্তরে	৩৫
• গম্ভীরা : প্রসঙ্গ ও পরিচিতি	৪৪
• [illegible] লোকনাট্য : ছৌ	৫৬
• বাংলার ‘গাজীপালা’	৬১
• বাংলার লোকঐতিহ্যে ‘জারি’	৭৭
• বাংলা যাত্রার উদ্ভব ও বিবর্তন	৮৭
• প্রসেনিয়াম রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক	৯৯
• থার্ড থিয়েটার : উৎস ও স্বরূপ সন্ধান	১০৪
• নাট্যধারার বিবর্তন : পথনাটক ও অঙ্গননাট্য	১১৫
• সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা	১২৬

Bipin Chandra Memorial Library
ESTD.- 1971
SILCHAR
Radhamadhab College

নান্দীমুখ

সভ্যতার ইতিহাসে অভিনয় ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে অনুমান করা যেতে পারে যে গুহাবাসী আদিম মানুষের জীবন ধারাতেই অভিনয়ের বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছিল। বলা হয়, মানুষ যেদিন কথা বলতে শুরু করেছে সেদিন থেকেই গল্প বলার সূত্রপাত; তেমনি মানুষ যেদিন তার ভাবনাকে অঙ্গচালনার মাধ্যমে ইশারায়, ইঙ্গিতে প্রকাশ করতে শুরু করেছে সেদিন থেকে অভিনয়ের সূত্রপাত।

সময়ের পথ বেয়ে মানব সভ্যতার ইতিহাসে ক্রমবিবর্তন ঘটলো। গুহাবাসী আদিম মানুষ তাদের গুহা কিংবা ঝুপড়ি ঘর ছেড়ে একদিন নদী কিংবা জলাশয়ের তীরে পাকাপাকিভাবে বসতি পত্তন করল। যাপনের অনিশ্চয়তায় অনেকটা নিশ্চয়তা দেখা দিল। সভ্যতার এই মোড়ে শিকারের জায়গা নিল কৃষি। ক্রমে কৃষি হলো মানুষের জীবন-জীবিকার অন্যতম অবলম্বন।

জীবন-জীবিকার ধরন যখন পাল্টায় স্বাভাবিকভাবে মানুষের চিন্তাধারাও পাল্টাতে থাকে, সাবেকি ধ্যান-ধারণায় ছেদ পড়ে। সভ্যতার ক্রম উন্নয়নের এই পর্যায়ে এসে দেখি আদিম মানুষের প্রকাশভঙ্গির অনেকটাই পাল্টে গেছে; পাল্টানোটা স্বাভাবিক। একসময় শুধু ইঙ্গিত-ইশারা-নৃত্যের মাধ্যমে আদিম অধিবাসীরা তাদের আনন্দ কিংবা নিরানন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতো। পরবর্তীতে এর সঙ্গে যুক্ত হল কৃষিকেন্দ্রিক সংহত সমাজের সমাজ-ভাবনা, সামূহিক মনস্তত্ত্ব তথা আনন্দ ও বেদনা প্রকাশের নিত্যনতুন উপকরণ। ফলে অভিনয় তথা নাট্যের ইতিহাসে নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে কৃষিকেন্দ্রিক সমাজ, যে সমাজ 'লোকসমাজ' নামে পরিচিত। এবং তাদের সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত নাট্যধারাটির নামকরণ করা হলো 'লোকনাট্য' নামে।

বাংলা লোকনাট্য বিষয়ক একটি সামগ্রিক আলোচনার পাশাপাশি বেশকিছু লোকনাট্যের বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে এই গ্রন্থে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ঘাটু, আলকাপ, গম্ভীরা, ছৌ, গাজী ও জারি লোকনাট্যের ইত্যাদি ধারা সম্পর্কিত আলোচনা।

আধুনিককালের নাটক, নাট্যশৈলী ও নাট্যমঞ্চ বারবার তার গতিপথ বদলেছে।

সময়কে কেন্দ্র করে সৃষ্ট জটিল সমাজ ও জীবন যেহেতু নাটক তথা নাট্যশৈলী ও থিয়েটারের অন্যতম অবলম্বন; তাই এই সময়ে নাট্যধারায় দেখা গেছে জটিল থেকে জটিলতর পথ পরিক্রমার ইতিহাস। এক সময় খোলা মাঠের মধ্যে তৈরি করা লোকনাট্যের আসর গ্রামীণ সাধারণ মানুষের আনন্দের খোরাক যোগাতো। ক্রমে সেই স্থান দখল করেছে 'যাত্রা'। তারপর ইংরেজ আগমনের ফলে এই যাত্রার আসরের অনেকটাই দখল করে নিল প্রসেনিয়াম রঙ্গমঞ্চ। সেখান থেকে বাংলার নাট্যমঞ্চ খনন করলো অন্য এক পথ। এর নাম 'থার্ড থিয়েটার'। এর থেকেও আরো একধাপ এগিয়ে নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে নতুন ধারণার জন্ম দিলেন বাংলার নাট্যশিল্পীরা যার নামকরণ হলো 'পথনাটক ও অঙ্গন নাট্য'।

আমাদের ক্ষুদ্র কলেবরের এই গ্রন্থে লোকনাট্য ও যাত্রার বিবর্তনের পথ বেয়ে বাংলায় প্রসেনিয়াম থিয়েটারের প্রচলন এবং সেখান থেকে বাংলা থিয়েটারের জগতে কীভাবে ক্রমে থার্ড থিয়েটার কিংবা অঙ্গন নাটক ও পথনাটকের ধারণা এলো এ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস করা হয়েছে।

আমাদের এই প্রয়াস ছাত্র, গবেষক, অধ্যাপকমন্ডলী, নাটকের দর্শকমন্ডলীর যদি উপকারে আসে তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। এই গ্রন্থ প্রকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন নাইস্‌টি গ্রাফিক্স, শিলচর এর কর্ণধার দেবাংশু চক্রবর্তী এবং ক্রিয়েটিভ পাবলিকেশন, কলকাতা এর কর্ণধার পরেশনাথ রায় মহাশয়। তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

নমস্কারান্তে---

৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২। রমাকান্ত দাস

শিলচর অনির্বাণ দত্ত

অভিনয় : ধরন ও প্রকারভেদ

ছন্দ ও সৌন্দর্য বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান দুটি সুপ্রাচীন বৈশিষ্ট্য। সৌন্দর্যের দ্বারা যেমন বস্তু ও জীব জগতের বিচিত্র রূপ রস মাধুর্য প্রকাশ পায়, ঠিক তেমনি ছন্দ বিশ্ব জগতে এনে দেয় তাল ও লয়ের সামঞ্জস্য। মানব সভ্যতা পত্তনের প্রাকলগ্ন থেকে মানুষ নিজ নিজ জীবন সাধনাকে জগতের এই দুটি সত্যের সঙ্গে মেল বন্ধনে সচেষ্ট হয়েছে। কালক্রমে এরই ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয় শিল্পের। শিল্প সৃষ্টিতে তিনটি বস্তুর মিলন ঘটে। প্রথমটি হল উপকরণ (সাজসজ্জা, কৃত্রিম আলো, শব্দ ইত্যাদি), দ্বিতীয়টি আঙ্গিক-লীলা-বৈচিত্র্য (কণ্ঠস্বর, হস্তপদ, মুখ ইত্যাদি সঞ্চালন), যেখানে শিল্পীর শিল্প সাধনার যথার্থ পরিচয় থাকাটা খুবই জরুরি এবং তৃতীয়টি হল শিল্পীর মানসিক ভাব সংস্পর্শ, যেখানে সূক্ষ্ম চিন্তা, কল্পনা ও আবেগ সক্রিয় থাকে, যা শিল্প সাধনার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে।

নৃত্য ও সঙ্গীত পৃথিবীর প্রাচীনতম শিল্প বিশেষ। কালক্রমে এই নৃত্য ও সঙ্গীত মিলিত হয়ে নতুন শিল্পের সৃষ্টি করেছে। এরই নাম অভিনয়। পূর্বে যেখানে সঙ্গীতের মধ্যে সুর সাধনাই মূল ছিল, পরবর্তীতে সেই সুর সাধনা নতুন রূপে স্বর সাধনায় পরিণত হল এবং নানা স্বর বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে অঙ্গ চালনা ও স্বরলীলাই অভিনয় রীতি হিসাবে পরিচয় লাভ করলো। অভিনয় শিল্প নৃত্য শিল্পের বিবর্তিত রূপ। আবার অন্যদিকে বিচার করলে সঙ্গীত ও নৃত্য যুক্ত হয়েও নতুন শিল্প শাখার জন্ম হয়েছে যাকে মিশ্র শিল্প বলা হয়। যেমন— গম্ভীরা, বাউল ইত্যাদি। তাছাড়া সঙ্গীত ও অভিনয়ের মিলনে সৃষ্টি হয়েছে গীতিনাট্য, গীতাভিনয়, যাত্রা এবং নৃত্য ও অভিনয়ের সহযোগে রূপায়িত হয়েছে বিভিন্ন প্রকার লোকনাট্য ও নৃত্যনাট্য।[১] অভিনয় দু-ধরনের— সংলাপযুক্ত ও সংলাপবিহীন। সাজগোজ করে কৃত্রিম অঙ্গভঙ্গি করে অন্য একটি চরিত্রের অনুকরণ করাই অভিনয়। অভিনয় এমন একটি ক্রিয়াকলাপ যেখানে কোনও গল্প এক বা একাধিক অভিনেতা বা অভিনেত্রী দ্বারা মঞ্চস্থ করা হয়। যাঁরা/যিনি একটি চরিত্রের সার্বিকরূপ পরিস্ফুট করেন থিয়েটার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, রেডিও বা অন্য কোনও মাধ্যম ব্যবহার করে। অভিনয়ে একটি দক্ষতার ব্যাপার জড়িত রয়েছে যার মধ্যে একটি উন্নত কল্পনা, সংবেদনশীল সুবিধা, শারীরিক প্রকাশ, কণ্ঠস্বর প্রক্ষেপণ, বক্তৃতার স্পষ্টতা এবং নাটকের ব্যাখ্যা দেওয়ার

ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও অভিনয় উপভাষা, উচ্চারণ, সংশোধন, পর্যবেক্ষণ এবং অনুকরণ, মাইম এবং মঞ্চের লড়াইয়ের নিয়োগের সক্ষমতা দাবি করে। অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের প্রায়শই, দৃশ্য-কাজ, শ্রুতি কৌশল এবং ক্যামেরার জন্য অভিনয়ের সাথে সম্পর্কিত পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণের জন্য অনেক প্রশিক্ষক থাকেন।

অভিনয় সংলাপ সহ বা সংলাপবিহীন অন্য একটি চরিত্রের আবেগ প্রকাশ। সাজগোজ করে কৃত্রিম অঙ্গভঙ্গি করে অন্য একটি চরিত্রের অনুকরণ করাই হল অভিনয়।

অভিনয়ের প্রকারভেদ

অলঙ্কার শাস্ত্র মতে অভিনয় চার প্রকার —

- বাচিক অভিনয়
- আঙ্গিক অভিনয়
- আহার্য অভিনয়
- সাত্ত্বিক অভিনয়

বাচিক অভিনয় : অভিনয়কে পরিপূর্ণতা দানের জন্য কণ্ঠস্বরও ব্যবহার করতে হয়। কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে যে অভিনয় করা হয় সেটাই বাচিক অভিনয়। বাচিক অভিনয় ছাড়া অভিনয় পরিপূর্ণ হয় না।

আঙ্গিক অভিনয় : অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করে যে অভিনয় করা হয়, সেটাই আঙ্গিক অভিনয়। শরীর ব্যবহার না করলে অভিনয় পরিপূর্ণ হয় না বলেই অভিনয়ে শারীরিক বিভিন্ন ভঙ্গি ব্যবহার অপরিহার্য।

আহার্য অভিনয় : অভিনয়কে পূর্ণমাত্রায় বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক করার জন্য পোশাক, অঙ্গচালনা, আলো ও মঞ্চ ব্যবহার করতে হয়। অভিনয়ের জন্য ব্যবহৃত এই সব উপাদান ছাড়া অভিনয় পরিপূর্ণ রূপ লাভ করতে পারে না। বাহ্য এইসব উপাদান ব্যবহার করে যে অভিনয় করা হয়, সেটাই আহার্য অভিনয়।

সাত্ত্বিক অভিনয় : সত্তা বা মনকে অভিনয়ে অর্ন্তভুক্ত না করলে অভিনয় পূর্ণতা পায় না। মনের ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ ও অন্তর্ভুক্ত করে যে অভিনয় করা হয়, সেটাই সাত্ত্বিক অভিনয়। মূলত আবেগ ব্যবহার না করে অভিনয় করলে সেটা পরিপূর্ণতা লাভ করে না। আর আবেগ ব্যবহার করতে হলেই অভিনেতাকে মন নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এই মন নিয়ন্ত্রণ করে যে অভিনয়, সেটাই সাত্ত্বিক অভিনয়। দৃশ্যতা ও শ্রাব্যতা অনুযায়ী অভিনয় রীতিকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। সেগুলি হলো, মূকাভিনয়, নির্বাক চিত্রাভিনয়, সবাক চিত্রাভিনয়, মঞ্চাভিনয় ও বেতার অভিনয়। মূকাভিনয় ও নির্বাক চিত্রাভিনয় শুধুমাত্র দৃশ্য, সবাক চিত্রাভিনয় ও মঞ্চাভিনয় দৃশ্য ও শ্রাব্য উভয়ই এবং বেতার-অভিনয় শুধুমাত্র শ্রাব্য। মূকাভিনয় ও নির্বাক চিত্রাভিনয় শুধুমাত্র দৃশ্য বলে কেবল আঙ্গিক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে

সব ভাব প্রকাশ করতে হয়। সেজন্য অঙ্গসঞ্চালনে একেবারে স্পষ্ট ও একটু প্রবল ভঙ্গি দরকার। দর্শকদেরও একটু সচেতন ও মনোযোগী থাকা প্রয়োজন যাতে তারা শুধুমাত্র আঙ্গিক অভিনয় থেকেই তারা সমস্ত ভাবটি বুঝে নিতে পারে। আবার বেতার-অভিনয়ও শুধুমাত্র শ্রাব্য বলে সেই অভিনয় থেকে রস গ্রহণ করতে গেলে শ্রোতাদের পরিবেশ-চিত্র এবং চরিত্রের রূপ এঁকে তুলতে হবে।

মানদণ্ডের বিচারে নাটক মূলত দু-প্রকার। পাঠযোগ্য ও অভিনয় যোগ্য। আবার অভিনয়যোগ্য নাটকেরও শ্রেণি বিভাগ লক্ষ করা যায়, কেননা কেবল মঞ্চে অভিনয়ই একমাত্র অভিনয় নয়। অভিনয়যোগ্য নাটকেরও রকমভেদ দেখা যায়। যথা,

অভিনয়

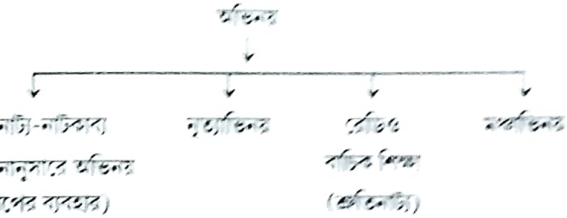

- কাব্যনাট্য-নাটিকাদি (প্রয়োজনানুসারে অভিনয় সংলাপের ব্যবহার)
- নৃত্যাভিনয়
- রেডিও নাটক শিল্প (শ্রুতিনাটক)
- মঞ্চাভিনয়

পাঠযোগ্য নাটকে পাঠক নিজ কণ্ঠস্বরের দ্বারা বা আবৃত্তির দ্বারা নিজে নিজেই নাটক পাঠ করেন। এখানে দর্শক থাকে না। কেবল পাঠের মধ্যে দিয়ে পাঠক পাঠ পিপাসা নিবারিত করেন। কিন্তু অভিনয়-যোগ্য সবরকম নাটকই দর্শকের কাছে দায়বদ্ধ। এখানে দর্শককে বোঝানোর দায় নাট্যপরিচালকের থেকে যায়। এমনকি নাটকের অভিনয়ের সাথে যুক্ত সকল ব্যক্তিরই দায়বদ্ধতা থাকে। তাই অভিনীত নাটকে মঞ্চ অভিনেতা, পরিচালক ইত্যাদির মতই দর্শকের স্থান মুখ্য।

অভিনয়ের দু-টি দিক, একটি হলো, 'একক অভিনয়', অপরটি 'দলগত অভিনয়'। যখন কোনো একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রী কোন নির্দিষ্ট বিষয়কে সংলাপ অথবা সংলাপবিহীনভাবে, অঙ্গচালনার দ্বারা সাজগোজ করে কোন এক চরিত্রকে অনুকরণ করে দর্শক শ্রোতাদের কাছে উপস্থাপিত করেন তখন তাকে বলা হয় 'একক অভিনয়'। দলগত অভিনয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংখ্যা বেশি থাকে এবং তাঁরা আলাপচারিতার মাধ্যমে কোন বিষয়কেন্দ্রিক গল্পকে সংলাপ ও অঙ্গচালনার মাধ্যমে দর্শক শ্রোতার সামনে তুলে ধরেন। তবে, অনেকসময় একক বা দলগত অভিনয় সংলাপহীন বা দৃশ্যহীনও হতে পারে। যেমন— বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত দৃশ্যহীন নানাবিধ বিষয়কেন্দ্রিক অভিনয় কিংবা মঞ্চে অভিনীত মূকাভিনয় মূলক সংলাপহীন অভিনয় রীতি।

অভিনেতার স্থান নাট্যকার ও দর্শকের মাঝখানে। তাই তাকে নাট্যকার রচিত সংলাপ যেমন মাথায় রাখতে হয়, তেমনি দর্শকের মেজাজও বুঝতে হয়। নাট্যকার একটি কথা

বলেই খালাস, কিন্তু সেই কথা কেমনভাবে বললে দর্শক গ্রহণ করবে তা শুধু অভিনেতাই জানে। নাট্যকারের অস্ফুট তত্ত্বকে অভিনেতা/অভিনেত্রীই স্ফুট করে এবং নাট্যকারের সূক্ষ্ম কল্পনাশ্রিত চরিত্রকে তারাই প্রত্যক্ষ ও সজীব করে তোলে। সেজন্য তার ক্ষমতা অপরিসীম। নাট্যকারের একটি আপাত-সরল উক্তিকে যে কত রসবৈচিত্র্যে প্রয়োগ করা যায় তা বিভিন্ন শক্তিমান অভিনতার অভিনয়ের মাধ্যমে বোঝা যায়।[৪] একটি চরিত্রের প্রকৃতি যে কত বিভিন্ন ধরনের হতে পারে তা বিভিন্ন অভিনেতার মধ্য দিয়ে একই চরিত্রাভিনয় থেকে অনুধাবন করা যায়।

একক অভিনয়ে অভিনেতাই মূল। একক অভিনয়ে দর্শক-শ্রোতার মধ্যে ক্লান্তি উৎপাদনের ভয় থাকে বলে এধরনের অভিনয়ে নাটকীয় গুণের পাশাপাশি কল্পনার সাম্রাজ্য গড়ে তোলা হয়। একক অভিনয় রীতিতে অভিনেতা/অভিনেত্রী নাটকীয় পরিস্থিতিতে অভিনীত চরিত্রের দ্বারা নিজেকে উন্মোচন করেন। একক অভিনয়ে অন্য চরিত্রের কোনো প্রত্যুত্তর না থাকলেও তার প্রতিক্রিয়া পাঠক বা শ্রোতা নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কল্পনা করে নেন।

সংলাপ ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে অভিনয়রীতিই একক অভিনয়ের মূল ভিত্তি। কখনো সংলাপের মাধ্যমে কাহিনি ও ঘটনার প্রকাশ হয়, আবার কখনো দেহগত ভঙ্গিমা ও মুদ্রায় কাহিনি ও ঘটনা বোধগম্য হয়। একক অভিনয়ে উত্তম পুরুষ বক্তা হিসেবে বা অভিনয় শিল্পী হিসেবে চরিত্রের অর্ন্তলোক উদ্ঘাটন করে। একক অভিনয়ে অভিনীত চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ও দর্শক শ্রোতাদের কাছে উক্ত চরিত্রের গ্রহণযোগ্যতা অভিনেতার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। একক অভিনয়কেন্দ্রিক শিল্পের সার্থকতা সেই নির্দিষ্ট অভিনেতার দক্ষতার উপর নির্ভরশীল।

দলগত অভিনয়ে অভিনেতাকে শুধুমাত্র স্বরবৈচিত্র্য ও ভাবপ্রকাশক অঙ্গভঙ্গির দ্বারা দর্শকের সামনে কোনো বিষয় বা কাহিনিকে উপস্থাপন করলে হবে না। সেই সঙ্গে তাকে নিজের অভিনয়ের মধ্যে তন্ময় হতে হয়। আবার পার্শ্ববর্তী অভিনেতা ও দর্শকদের সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকতে হয়। এই এককত্ব ও দলীয়তা, তন্ময়তা ও সচেতনতা নিয়েই অভিনয়। তাকে আবেগিক হতে হয়, আবার অতি-আবেগ সংযতও করতে হয়। হাত, চোখ ও ভ্রূদ্বয়ের সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে বিশেষ বিশেষ ভাব প্রকাশ করতে হয়, আবার সেই সঞ্চালন যদি মাত্রাতিরিক্ত হয়ে পড়ে তবে তা কৃত্রিম ও হাস্যকর হয়ে পড়ে। কণ্ঠস্বর প্রয়োজনবোধে চড়া করতে হয়, কিন্তু খুব বেশি উচ্চস্বরে সংলাপ পরিবেশন করলে কণ্ঠস্বর বিভক্ত ও বিকৃত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাকে করুণ ও গম্ভীর করবার জন্য স্বর খাদে নামাতে হবে, কিন্তু এমন স্তরে নামালে চলবে না যাতে দর্শকদের শ্রুতির অগম্য হয়ে পড়ে। নাটকে গতিবেগ আনবার জন্য দ্রুত উচ্চারণ ও অঙ্গ-সঞ্চালন হয়তো প্রয়োজন হয়

কিন্তু এমন দ্রুত উচ্চারণ হবে না যাতে শব্দগুলি অস্পষ্ট ও জড়িত ধ্বনিসমষ্টিতে পরিণত হয়, এবং এমনি ত্বরিত অঙ্গ-সঞ্চালনও হবে না যাতে তা অবোধ্য ও অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই সুপরিপাটি সংযম ও সুনিয়ন্ত্রিত সামঞ্জস্যই হল অভিনয়ের মূল কথা।[৫]

সূত্রনির্দেশ :

১। ড. অজিত কুমার ঘোষ, নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ, দে'জ প্রাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১০, কলকাতা, পৃঃ ১৯২।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৩-১৯৪।
৩। ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা, করুণা প্রকাশনী, ২০১০, পৃঃ ৪৩-৪৪।
৪। ড. অজিত কুমার ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯২-১৯৩।
৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯২।

লোকনাট্য : বাংলার প্রাচীন নাট্যধারা

।। এক।।

সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা। প্রাকৃতিক পরিবেশের নিয়ন্ত্রণের দ্বারাই অঞ্চলভেদে গড়ে ওঠে নানা সাংস্কৃতিক বলয়। সাংস্কৃতিক বলয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বিভিন্ন লৌকিক আঙ্গিক। এর মধ্যে অন্যতম একটি আঙ্গিক হলো লোকনাট্য। এটি লোকসমাজের জীবনদর্শন। গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের সামগ্রিক বিষয়ের আলেখ্য। লোকনাট্য একটি সাংস্কৃতিক ধারা বিশেষ। যার মধ্যে সংগুপ্ত থাকে আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রথা-আচার, লোকধর্ম, বিশ্বাস সংস্কার, প্রতিবাদ ইত্যাদি বিষয়। এটি অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক, অনুকৃতিমূলক ও বাককেন্দ্রিক শিল্প।

আদিযুগের শিকারজীবী মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করতো। গোষ্ঠীর সব সদস্য শিকারে যাওয়ার আগে শিকারে সাফল্য লাভের জন্য প্রার্থনা ও জাদুমূলক নানা অঙ্গ-ভঙ্গি করতো। শিকারে সাফল্য হলে আদিম মানুষরা শিকার করা পশুটিকে নিয়ে গুহায় এসে নানা দেহভঙ্গিমা করে আনন্দ প্রকাশ করতো। পরবর্তীতে এই দেহ ভঙ্গিমা বিভিন্ন আঙ্গিকের রূপ লাভ করতে থাকে এবং কালক্রমে এর সঙ্গে তাল ও লয় যুক্ত হয়ে 'নৃত্যের' সৃষ্টি। পরবর্তীতে অভিনয় সমৃদ্ধ হয়ে নাট্যিক রূপ লাভ করে। এভাবে উদ্ভব হয় লোকনাট্যের। লোকনাট্যের জন্ম লোকনৃত্য থেকে। লোকনাট্য কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কোনো একক সমাজ থেকে সৃষ্টি হয়নি। মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ক্রম পরম্পরায় উৎসব ও ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে লোকনাট্যের উদ্ভব ঘটেছে। এটি বহু ধারা-উপধারার ও অতীত স্মৃতির সংহত রূপ। ডায়োনিসাসের শোভাযাত্রার মতো আমাদের দেশেও দেববিগ্রহ নিয়ে শোভাযাত্রা করা হতো। শোভাযাত্রায় সঙ্গীত, নৃত্য ও কৌতুকজনক অঙ্গভঙ্গি দেখা যেতো। কালক্রমে এইসব উপাদানের সঙ্গে কিছু কিছু কথা ও কাহিনি যুক্ত হয়ে লোকনাট্যের উদ্ভব।[১] পাঁচালী থেকে যাত্রা বা বাংলা লোকনাট্যের উদ্ভব হয়েছে বলেও অনেকে মনে করেন। ''যখনই সঙ্গীত প্রধান নয়, সহযোগী অঙ্গ হয়ে ওঠে, যখনই নৃত্য সার্বিক প্রাধান্য না পেয়ে শুধুমাত্র রমণীয় স্পর্শ ও সুকুমার ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে

Accession No. 19681
Date 7/10/24
C 891.443/DAS

সাহায্য করে এবং সংলাপ ও অবিচ্ছিন্ন কাহিনীর মধ্য দিয়ে একটি গতিশীল নাট্যক্রিয়া দর্শকদের কৌতূহলী ও উৎকণ্ঠিত করে রাখে, তখনই জন্ম হয় লোকনাট্যের।''[২]

'লোকনাট্য' আধুনিক শব্দ। দুটি শব্দের সমষ্টি এটি। একটি হল 'লোক' অপরটি 'নাট্য'। লোকনাট্যের ইংরাজি প্রতিশব্দ 'Folk drama'। তবে ইংরাজি 'Folk' ও বাংলা 'লোক' শব্দের মধ্যে বিষয়গত ও অর্থগত তফাৎ আছে। এবার প্রশ্ন হলো 'লোক' কে বা কারা এবং 'নাট্য' কী? 'লোক' সম্বন্ধে 'নাটকের কথা' গ্রন্থে অজিত ঘোষ মত প্রকাশ করে বলেন যে ''লোক শব্দটির অভিধানিক অর্থ মানুষ বা ব্যক্তি হলেও বর্তমানে বিশেষ অর্থে নাগরিক মানব সম্প্রদায় থেকে ভিন্ন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ ঐতিহ্য ধারাবাহী গ্রামীণ মানব সম্প্রদায়কেই বোঝায়।[৩] ''নাট্য শব্দটির অর্থ হল 'নটের কর্ম''।[৪] নগেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন — ''... রঙ্গভূমিতে অভিনয় দ্বারা যে কার্যের প্রদর্শন হইয়া থাকে, তাহাকে নাটক কহে।''[৫]

লোকনাট্যের সংজ্ঞা নিয়ে নানা মতামত রয়েছে। লোকসংস্কৃতিবিদ্ আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকনাট্যের সংজ্ঞায় বলেছেন, ''লোকনাট্য লোকজীবনের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে মুখে মুখে রচিত এবং অভিনীত নাটক। ...কোনো পৌরাণিক কিংবা ধর্মীয় বা ধর্মপ্রচারমূলক বিষয়বস্তু হলে তা লোকনাট্য বলে গণ্য হবে না।''[৬] নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে, ''কোনো লোকগোষ্ঠীর সংহতি জ্ঞাপক Myth, Ritual জীবন চর্চার সকল দিক যখন তাদের অভিনয় ও সংলাপে প্রতিফলিত হয়, তখন তা লোকনাট্য হয়।''[৭] দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের সংজ্ঞা মতে, ''গ্রামীণ সমাজে জনসাধারণের জীবনকে আশ্রয় করে মুখে মুখে রচিত রচনা যখন নাট্যলক্ষণাক্রান্ত হয়ে ওঠে এবং যা আসরে নৃত্য-গীতের মধ্য দিয়ে অভিনীত হয় তাই লোকনাট্য।''[৮] ''লোকেদের দ্বারা রচিত, অভিনীত এবং লোকেদের সম্মুখে পরিবেশিত নাটককেই লোকনাট্য বলে।''[৯] —এই মত অজিত কুমার ঘোষ মহাশয়ের। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রদত্ত লোকনাট্যের সংজ্ঞাটি হল ''আমাদের দেশে লোকনাট্য বলতে সাধারণত যাত্রা নাটককেই বুঝায় এবং এই অর্থেই শব্দটি আজও প্রচলিত রহিয়াছে।''[১০] ''লোকনাট্য তাকেই বলব, যা একটি জনগোষ্ঠী সৃষ্ট, গ্রামীণ জনসাধারণের জীবন ভিত্তিক, মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখে প্রচারিত।''[১১] সংজ্ঞাটি শ্রদ্ধেয় শিশির মজুমদারের। 'The New Encyclopaedia Britanica' গ্রন্থে 'Folk Drama'-র যে সংজ্ঞাটি দেওয়া হয়েছে তা হলো "Belonging only remotely to oral literature is folk drama. Dances many of them elaborate, with masks portraying animal or human characters, and sometimes containing speechs and songs, are to be found in many parts of the preliterate world. Though the action and the dramatic imitation is always the most prominent part of

such performances, these may be part of a ritual and involve speaking or chanting of sacred texts learned and passed on the word of mouth."[১২] আমাদের দেশে প্রাচীনকালে দেবদেবীর বিগ্রহ নিয়ে নৃত্য-গীত সহযোগে শোভাযাত্রা করা হতো। এই নৃত্য-গীতের সঙ্গে কালক্রমে কথা ও কাহিনি যুক্ত হয়ে লোকনাট্যের উদ্ভব হলো।[১৩]

লোকনাট্য শুধু মুখে মুখে রচিত হয় না। লিখিত আকারেও তা পাওয়া যায়। উদাহরণ 'বোলান' লোকনাট্য। সব লোকনাট্য লোকজীবনের কাহিনির উপর নির্ভর নয়। অনেক সময় পৌরাণিক কাহিনি নিয়েও এগুলো পরিবেশিত হয়। Myth, Ritual ও জীবনচর্যার সব দিক একসঙ্গে ফুটিয়ে তোলা এতে সম্ভব নয়। গদ্যসংলাপ, আসর, অভিনয় রীতি, রূপসজ্জাও বর্তমান লোক-নাট্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার যাত্রার সঙ্গে লোকনাট্যের কিছু কিছু বিষয়ে মিল থাকলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর।

লোকনাট্যের ইতিহাস সুপ্রাচীন। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকনাট্যের আঙ্গিকে স্থান পেয়েছে নানা উপাদান। তাই কালে-কালে এর সংজ্ঞায়ও পরিবর্তন ঘটেছে। লোকনাট্য হলো-লোক সমাজ দ্বারা, লোকসমাজ হতে সৃষ্ট মৌখিক ও লিখিত রূপে প্রাপ্ত, পৌরাণিক ও সামাজিক বিষয়কেন্দ্রিক, নানা চরিত্র সংবলিত সংলাপ নৃত্য-গীত-বাদ্য সমন্বিত প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও শাস্ত্র নিরপেক্ষ ঐতিহ্যানুসারী সাজসজ্জা ও অভিনয়রীতি কালানুক্রমে বিবর্তিত হয়ে যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে লোকসমাজকে প্রতিভাসিত করে, সেই ঐতিহ্যময় অভিকরণমূলক দৃশ্যকলা।

।। দুই ।।

লোকনাট্যকে সাধারণত দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। একটি হল 'আনুষ্ঠানিক লোকনাট্য', অপরটি 'অনানুষ্ঠানিক লোকনাট্য'। আনুষ্ঠানিক লোকনাট্য অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক আর অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে যে কোন সময়ে অনানুষ্ঠানিক লোকনাট্য পরিবেশন হয়ে থাকে। লোকনাট্য অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলা ভাষাভাষী সব অঞ্চলেই অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে প্রচলিত লোকনাট্যকে আঙ্গিকের আধারে উপরোক্ত বিভাগ ছাড়াও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। সেগুলি হলো— ধর্মভিত্তিক, অনুষ্ঠানভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক, বিষয়ভিত্তিক, লিঙ্গভিত্তিক ও মুখোশকেন্দ্রিক। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান যেসব লোকনাট্যে প্রাধান্য পায় সেগুলো 'ধর্মভিত্তিক লোকনাট্য'। যেমন— কুশান, বোলান, রামযাত্রা, জারিপালা ইত্যাদি। বঙ্গদেশের কিছু কিছু লোকনাট্য সীমাবদ্ধ থাকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোকসমাজে, সেগুলি 'অঞ্চলভিত্তিক লোকনাট্য' বলে পরিচিত। এরকম কয়েকটি লোকনাট্য হলো— আলকাপ, ঘাটু, গাজিপালা, দক্ষিণপূর্ববঙ্গের লেটো,

আলকাপ, বোলান; দক্ষিণবঙ্গের বনবিবি, গাজিপালা; উত্তরবঙ্গের কুশান, দোতরা; উত্তর মধ্যবঙ্গের —গম্ভীরা, ডোমনি; পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের ছৌ, মাছানি ইত্যাদি।

লোকনাট্য নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত। বিষয়বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ বঙ্গদেশের লোকনাট্যের ভাঁড়ার। পৌরাণিক (কুশান), ধর্মীয় (বিষহারা), সামাজিক (বোলান, লেটো) বিষয়ভিত্তিক লোকনাট্য বিভাগের পাশাপাশি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক (আলকাপ, গম্ভীরা) ও মিশ্র (গাজিপালা) আঙ্গিকের লোকনাট্য বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত। লিঙ্গগত চরিত্রের ভিত্তিতে তিনপ্রকার লোকনাট্য বঙ্গদেশে প্রচলিত। যেমন— পুরুষচরিত্র প্রধান লোকনাট্য 'নদিয়ার শিবা নিবাসের 'বোলান', নারী চরিত্র প্রধান লোকনাট্য 'সখীর নাচ' এবং উভয় চরিত্র প্রধান লোকনাট্য 'আলকাপ', 'গম্ভীরা' ইত্যাদি। এইসব লোকনাট্যে পুরুষরা নারী চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন। আবার নারী ও পুরুষ শিল্পীর অভিনয়ের ভিত্তিকে কেন্দ্র করে লোকনাট্যকে পুরুষশিল্পী প্রধান (আলকাপ, বোলান) ও নারী শিল্পী প্রধান (হুদুমদেও পালা) এই দুটি ভাগেও ভাগ করা যেতে পারে।

সব লোকনাট্যে মুখোশের ব্যবহার নেই। তবে নানা কামনা, জাদু সংশ্লিষ্ট কারণ ও উপস্থাপিত চরিত্রকে সুন্দর ও আকর্ষিত করে তুলতে কিছু লোকনাট্যে মুখোশের ব্যবহার সুপ্রাচীন। বঙ্গদেশে একদিকে যেমন 'গম্ভীরা', 'ছৌ' প্রভৃতি লোকনাট্যগুলি মুখোশকেন্দ্রিক, ঠিক তেমনি 'বোলান','আলকাপ' ইত্যাদি হলো মুখোশবিহীন লোকনাট্য। শিষ্টনাট্য সাহিত্যের মতো লোকনাট্যের কোন অঙ্ক, পর্বাঙ্গ বা দৃশ্যভাগ নেই। তবে লোকনাট্যের একটি স্বতন্ত্র কাঠামো আছে।

সেই কাঠামোগুলিকে এভাবে সাজানো যায়—

১. বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান। বাদ্যযন্ত্রে থাকে ঢোলক, ডুগি-তবলা, জুড়ি, বাঁশি, খোল, বেহালা, হারমোনিয়াম, সারিন্দা, দোতারা, ব্যানা ইত্যাদি।
২. আসর বন্দনা, গীত ও নৃত্য।
৩. পালার পরিচায়ক গান। এটা বসেও হয়, দাঁড়িয়েও হয়, এই গানে ধুয়া থাকে।
৪. চরিত্রের গীত।
৫. চূড়া কাটা।
৬. পরিণতি।

লোকনাট্যে মূল কাহিনির সঙ্গে একাধিক উপকাহিনি যুক্ত হয়। কুশীলব বা শিল্পীর স্বাধীনতা এখানে বিপুল। কুশীলবদের প্রবেশ ও প্রস্থান আসরে উঠে দাঁড়ানো এবং বসে পড়ার মধ্য দিয়ে হয়। আসরেই সমস্ত শিল্পীরা বসে থাকেন। এখন অবশ্য কোন কোন পালায় প্রবেশ-প্রস্থান দেখা যায়। একজন শিল্পী কখনো কখনো একাধিক চরিত্রে অংশ নিয়ে থাকেন। সমগ্র পালায় একজন মুখ্য শিল্পী থাকেন যিনি

পালাটিকে নিয়ন্ত্রিত করেন।[১৪] 'অভিনয়' লোকনাট্যের গুরুত্বপূর্ণ রীতি। লোকনাট্যে অভিনয়ে অংশ গ্রহণকারীর দৈহিক গঠনের সঙ্গে জোরালো কণ্ঠ ও উচ্চারণের দিকে নজর থাকা আবশ্যক। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা' গ্রন্থে[১৫] লোকনাট্যের অভিনয়রীতিকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন।

সেগুলো হলো—

১. বিশ্লেষণাত্মক অভিনয়।
২. চমকদার ও ভঙ্গিময় অভিনয়।
৩. আবেগাত্মক অভিনয়।
৪. অতিনাটকীয় অভিনয়।
৫. মিশ্ররীতির অভিনয়।

প্রথম রীতির অভিনয়ে সবপ্রকার জবরদস্তি পরিহার করে সংযম, শিল্প-চেতনা ও মাত্রাবোধের সাহায্যে চরিত্র-রূপায়ণের প্রচেষ্টা থাকে। এতে প্রয়োজনীয় গাম্ভীর্য এবং চরিত্র বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধি ও কল্পনার পরিচয় থাকে। এই রীতির অভিনয় কঠিন সাধনা সাপেক্ষ। দ্বিতীয় রীতির অভিনয়েও চরিত্র সৃষ্টির প্রতি লক্ষ রাখা হয়। কিন্তু এটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে দর্শক মনে বিস্ময়াকর্ষণ সৃষ্টির জন্য এতে বিশেষ ধরনের চমক ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। অভ্যস্ত শিল্পী এমন অপ্রত্যাশিতভাবে এই সব চমকও অঙ্গাদিবিন্যাস প্রয়োগ করেন যে দর্শক মন এতে সহজেই আনন্দিত হয়ে উঠে। এই শ্রেণির অভিনয়ে চমক ও ভঙ্গি সংযোজনায় যাতে মুদ্রাদোষ দেখা না দেয় তার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়। এই জন্যই এই রীতির অভিনয়ে কৃতিত্বের প্রয়োজন। তৃতীয় পর্যায়ের অভিনয়ে চরিত্র-চিত্রণ অপেক্ষা কণ্ঠ ও আবেগের ওপর অধিক জোর দেওয়া হয়। আবেগময় গভীর কণ্ঠের উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে দর্শক মনে একপ্রকার দোলা দেওয়া এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। চতুর্থ রীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— অতিরঞ্জিত স্থূল শারীরিক উপায় এবং কণ্ঠে অস্বাভাবিক স্বর ও জোর আরোপের মধ্য দিয়ে দর্শকদের ভাবোত্তেজনার সৃষ্টি করবার প্রচেষ্টা। চরিত্রের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য ও আন্তরপ্রকাশের প্রতি দৃষ্টি এই অভিনয় রীতিতে অনুপস্থিত। পঞ্চম পদ্ধতির অনুসরণকারী অভিনেতারা কোন একটি বিশেষ রীতিকে প্রাধান্য না দিয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রীতির মিশ্র-প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেন। তাদের লক্ষ চরিত্র চিত্রণ।

লোকনাট্যের আসরে অভিনয়ের আর একটি রীতি ছিল। একে বক্তৃতামূলক অভিনয় রীতি বলা যেতে পারে। চরিত্র সৃষ্টি অপেক্ষা এতে বক্তৃতার প্রাধান্য। অভিনেতা অভিনয় করতে করতে সুযোগ বুঝে নানা বিষয়ে বক্তৃতার অবতারণা করেন। নাট্য বহির্ভূত এই বক্তৃতাই এর প্রধান আকর্ষণ। অধিকাংশ লোকনাট্যাভিনেতার অভিনয়ে সাধারণভাবে সুরেলা ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

লোকনাট্য-গঠনে কয়েকটি মুখ্য উপাদান আছে। এই উপাদানগুলোকে শ্রদ্ধেয় গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ছয়টি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

বিভাগগুলি এরকম[১৬] —

(১) সংগীত।
(২) সংলাপ সংযোজন।
(৩) কাহিনি ও ঘটনার উপস্থাপন।
(৪) চরিত্র সন্নিবেশ।
(৫) লোকশিক্ষা।
(৬) রসসৃষ্টি ব্যবস্থা।

।। তিন।।

লোকনাট্যের রচয়িতা, শিল্পীদল ও দর্শক-সকলেই লোকায়ত স্তরের মানুষ। নগরকেন্দ্রিক অভিজাত সমাজের পরিসর থেকে দূরে গ্রামের মাঠ, ঘাট, উঠান ও বারোয়ারী ছাদনাতলায় মুক্ত আকাশে এর উদ্ভব ও অভিনয়। এর মধ্যে পরিশীলিত নাট্যের মতো নির্দিষ্ট শিল্পশাসন বলতে কিছু নেই। দর্শকের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী এতে নিত্যনতুন উপাদান সংযোজিত হয়ে থাকে। মূল ধর্মমূলক বিষয়বস্তুর উপর লোকনাট্য রচিত হলেও সামাজিক-পারিপার্শ্বিক বিষয় এতে স্থান করে নিয়েছে। এগুলোতে সংলাপ অপেক্ষা সংগীতের প্রাধান্য থাকে। অভিনেতাদের জোরালো ও গভীর কণ্ঠস্বরের পাশাপাশি লোকনাট্যের অভিনয়ে আবৃত্তি ও সুরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্র এটির বিশিষ্ট অংশ বিশেষ। হাসি, ঠাট্টা, তামাশার মাধ্যমে দর্শককে আনন্দদানের পাশাপাশি ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কশাঘাতে দর্শকদের পুলকিত করা লোকনাট্যের লক্ষ। লোকনাট্য মূলত অলিখিত আখ্যান। তবে অভিজ্ঞতাজাত একধরনের শৃঙ্খলা এতে পরিলক্ষিত হয়। নাটকীয় উৎকণ্ঠা থাকলেও বাংলার লোকনাট্য মিলনাত্মক; বিয়োগান্তক নয়। মানুষের জীবনযাত্রার অভ্যন্তরীণ সংঘাত প্রকাশ সহ শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ-দুর্দশা-নৈরাশ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ফুটে ওঠে লোকনাট্যে।

লোকসংস্কৃতি অটল, অচল, স্থবির নয়। পরিবর্তনশীলতা লোকনাট্যের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। লোকসংস্কৃতি কালের সময় প্রবাহে বিবর্তিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। বিবর্তন ও পরিবর্তন না ঘটলে এর অপমৃত্যু ঘটবে। লোকসংস্কৃতির উক্ত বৈশিষ্ট্যের গতিপ্রকৃতির নিরিখে লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ যুগের পরিবর্তনে, অন্যান্য সংস্কৃতির প্রভাবে ও লোকমনের চাওয়া-পাওয়া সহ নানা কামনা-বাসনার ভাবনায় পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে।

লোকনাট্যে গদ্য ও পদ্য রূপে আঞ্চলিক ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে সংলাপ ব্যবহৃত হয়। এতে আঞ্চলিকতার প্রভাব ও প্রাধান্য বেশি। পোশাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বরতা এতে নেই। নিত্যদিনের ব্যবহার্য পোশাক পরিধান করেই অভিনেতারা অভিনয় করে থাকেন। 'বন্দনা' অংশ লোকনাট্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ-প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহার করে এতে পুরুষরা মহিলা চরিত্রে অভিনয় করে। লিখিত আখ্যান না থাকায় মাঝে মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ও চরিত্র লোকনাট্যে স্থান পায়। এগুলি বাণিজ্যিক নয়। জনগণকে আনন্দদান ও অভিনয় নেশার টানে নাট্যগুলি পরিবেশিত হয়ে থাকে। শিথিল প্লট, সরল প্রকৃতির রচনা রীতি, জটিলতাহীনতা, আয়তনে স্বল্পতা লোকনাট্যের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। লোকনাট্য পালার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট আদর্শ দর্শকের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস থাকে। অভিনেতা ও দর্শকদের মধ্যে স্থানিক নৈকট্য ও ঘনিষ্টতামূলক আঙ্গিক ব্যবহারের মাধ্যমে অভিনীত প্রতিক্রিয়া খুব সহজেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। 'সাজঘর' বলে সেখানে কিছু থাকে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিম্নোধৃত বক্তব্যটি হরগৌরী সম্বন্ধীয় গ্রাম্যছড়াগুলি সম্পর্কে হলেও এর থেকে লোকনাট্যের বিষয়বস্তু, চরিত্র ও উপস্থাপনার একটি আভাস পাওয়া যায়—

"... হরগৌরী সম্বন্ধীয় গ্রাম্যছাড়াগুলি বাস্তবভাবের। তাহা রচয়িতা ও শ্রোতাবর্গের একান্ত নিজের কথা। সেই সকল কাব্যে জামাতার নিন্দা, স্ত্রী পুরুষের কলহ ও গৃহস্থালীর বর্ণনা যাহা আছে তাহাতে রাজভাব বা দেবভাব কিছুই নাই, তাহাতে বাংলাদেশের গ্রাম্যকুটিরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত। তাহাতে কৈলাশ ও হিমালয় আমাদের পানা পুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাতে শিখর রাজি আমাদের আম বাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। যদি তাঁহারা নিজ নিজ অভ্রভেদী মূর্তি ধারণ করিবার চেষ্টা মাত্র করিতেন তাহা হইলে বাংলার গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের স্থান হইত না।"[১৭]

লোকমানস যে-ভাবে লোকনাট্যকে দেখতে চায়, দেখে তৃপ্তি উপভোগ করে লোকশিল্পী সেভাবেই লোকনাট্যে নিজস্ব ভাবের সংযোজন করে এগুলির পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও পরিবর্তন সাধিত করেন।

সূত্রনির্দেশ :

১। সনৎ কুমার মিত্র (সম্পা), বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক - আলোচনা এবং সংগ্রহ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ১৩।
২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।
৩। অজিত কুমার ঘোষ, নাটকের কথা, সাহিত্যলোক, তৃতীয় সংস্করণ, মাঘ, ১৩৯২, পৃ. ১৭২।

৪। সুকুমার সেন, নট-নাট্য-নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৩৯৯ বাংলা, পৃ. ৯।
৫। নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ, নবমভাগ, ১৯৮৮, পৃ. ৭১৩।
৬। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার সংস্কৃতি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৮২, পৃ. ১২৯।
৭। নির্মলেন্দু, ভৌমিক, 'জনজীবন, সংহত গোষ্ঠী ও বাঙলার লোকনাট্য, লোকশ্রুতি, ১৯৮৬, পৃ. ৫০।
৮। দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, নাট্যতত্ত্ব বিচার, মর্ডান বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৩৯১ বাংলা, পৃ. ২৬৫।
৯। ধ্রুব দাস, ভারতের লোকনাট্য, প্রতিভাস, ১৯৯২, পৃ. ০৯।
১০। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২, পৃ. ১।
১১। শিশির মজুমদার, 'উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য ও পশ্চিম দিনাজপুরের খনগান' 'ত্রিবৃত্ত, উত্তরবঙ্গ সংখ্যা, ১৯৭৮।
১২। The New Enclopaedia Britanica, Vol. 7, ১৯৭৫, পৃ. ৪৫৭।
১৩। অজিতকুমার ঘোষ যাত্রা, লোকনাট্য কী? (প্রবন্ধ), সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ডিসেম্বর, ২০০০,পৃ. ১৩।
১৪। দুলাল চৌধুরী (সম্পা), বাংলা লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অফ ফোকলোর, পুস্তকবিপণি, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২১১।
১৫। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, প্রাক্তক্ত। পৃ. ৯৬।
১৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
১৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী, ১৩৯৯ বাংলা, পৃ. ১০০।

কথকতা : প্রাচীন বাঙলার ঐতিহ্যিক পরম্পরা

'কথকতা' হলো কথার কার্য। বহুজন সমক্ষে ভাবভঙ্গির মাধ্যমে গীতাদি সহ পুরাণাদি পাঠ বা ব্যাখ্যা করাকে বলা হয় কথকতা। 'কথকতা' যিনি পরিবেশন করেন তিনি হলেন 'কথক'। যাঁকে কেউ বলেন 'ব্রাহ্মণ পুরাণ পাঠক' আবার অনেকের সম্ভাষণে 'পাঠক ঠাকুর'। 'কথক' হলো বক্তা, ব্যাখ্যাকারী। ভারতের ইতিহাসে সুপ্রাচীনকাল থেকে 'কথকবৃত্তি'-র সঙ্গে নির্ভরশীল লোকের নানা তথ্য পাওয়া যায়। কথকবৃত্তিধারী লোকেরা সুদূর অতীতকাল থেকে পুরাণের কথা বর্ণনা করে এবং পুরাণের নানা বিষয়কে পাঠ করে ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমাজে উপস্থাপিত করতেন।

কথকতার ঐতিহ্য প্রাচীন। এর শিল্পরূপটি মৌখিক। সমাজের লোক শিক্ষার ক্ষেত্রে কথকতা অতীতকালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কথকতার বিষয় সেসময় নানাবিধ ছিল, যেমন— ভাগবতকথা, রামকথা ও মহাভারতকথা ইত্যাদি। কথকতা পরিবেশনের জন্য একদিকে যেমন পাঠ ও আবৃত্তি সহকারে গদ্যের ব্যাখ্যা করা হত, ঠিক তেমনি বিষয়কে কেন্দ্র করে আবার গীত, বাচিক অভিনয়ের সাহায্যে এগুলোকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হতো। কথকতা পরিবেশনে কথক ঠাকুরকে একদিকে যেমন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা থাকা অতীব জরুরি ছিলো; অন্যদিকে ঠিক তেমনি তাঁকে সুরেলা কণ্ঠস্বরের অধিকারী, রসবোধক, পারিপার্শ্বিক জ্ঞান ও দর্শক শ্রোতা মন্ডলীর মনস্তত্ব সম্পর্কে সচেতনতা থাকা আবশ্যক ছিলো। কথকগোষ্ঠীই ভারতের নানা পুরাণের ঘটনাকে বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে ধনী-দরিদ্রের ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। কথকতার উপস্থাপন রীতি কথকের শৈক্ষিক মানদণ্ডের উপর নির্ভরশীল ছিলো। কথকের বিদ্যা শিক্ষার উপরই নানা পুরাণাদির ঘটনাকেন্দ্রিক ব্যাখ্যার পরিধি নির্ভর করতো। কখনও কখনও আবার পুরাণ কাহিনির ঘটনার সঙ্গে দেশজ উপাদান ও গল্প কথকতার বিষয় হয়ে উঠতো। সামাজিক ও কালগত অবস্থার পরিবর্তনে কথকতাকে প্রভাবিত করবার নানা সাক্ষ্য ইতিহাসের আলোকে আজও খোঁজে পাওয়া যায়।

হরিপদ ভৌমিক কথকতা সম্পর্কে মত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন যে 'গদাধর শিরমণি' এবং 'রামধন তর্ক বাগীশরা' প্রথম শাস্ত্র-পুরাণের ব্যাখ্যাকে বাংলা ভাষায় প্রবর্তন

করেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আমাদের অবগত করেন যে এঁরা শুধু মাত্র বিষয়ের নিরস ব্যাখ্যা নয়, এর সঙ্গে যুক্ত করেন সঙ্গীত। শূলের বাক্যকে কথকতার 'সাট' বলা হয়। 'সাট' আবার 'চুর্নী' নামে অভিহিত। চুর্নীর মধ্যে ব্যবহার করা হয় সঙ্কেত। যেমন ভীষ্ম উবাচ ইত্যাদি। চুর্নীর মধ্যে যে সমস্ত কথা থাকে তাকে বলা হয় চূর্ণক। কথক ঠাকুরকে চূর্ণ ছাড়া রাত্রি বর্ণনা, মধ্যাহ্ন বর্ণনা, গ্রীষ্মবর্ণনা, বসন্তবর্ণনা, দেশ বর্ণনা, বেশ্যা বর্ণনা প্রভৃতি মুখস্ত রাখতেই হত। উচ্চ বেদির উপর শালগ্রাম শিলা স্থাপন করে কথক ঠাকুর বাংলা সংস্কৃত মেশানো সঙ্গীত সহযোগে প্রথমে মঙ্গলাচরণ করে কথার সূচনা করেন। পরে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে বিষয় নির্বাচন করে তার ব্যাখ্যা সহ পরিবেশন করতেন। বামনভিক্ষা, ধ্রুবচরিত্র, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি বিষয় শুনবার জন্য মানুষও ভিড় করতেন।

প্রথম দিকে রাজা, জমিদার বা অর্থশালী ব্যক্তিগণের পৃষ্ঠপোষকতায় কথকতার আসর বসত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কথকতার গৌরবময় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্ব শুরু। এই পর্বের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নববাবু সম্প্রদায়। এরপর থেকে কথকতার জনপ্রিয়তা ক্রমশ কমতে থাকে। কথকতা যিনি পরিবেশন করেন তিনি ঠাকুর বা ব্রাহ্মণ। তাই তিনি কথকঠাকুর। তিনি একধারে বক্তা ও গায়ক। তাঁর কণ্ঠের মাধুর্যে হাজার-হাজার মানুষের মনে ভাবের বন্যা বইয়ে একই সঙ্গে শিল্প-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে জনশিক্ষা ও জনসংযোগের কাজ সম্পন্ন করতেন। তাই কথকতার শ্রোতার মধ্যে রাজা, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বেশ্যা, ডাকাত, ব্যবসায়ী, পথযাত্রী প্রমুখ থাকতেন। ভক্তিমূলক কথকতার ধারাই সেকালে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সেকালে রামধন তর্কবাগীশ, গদাধর শিরোমণি ছাড়াও উমাকান্ত শিরোমণি, ধরণীধর শিরোমণি, কৃষ্ণহরি ভট্টাচার্য প্রমুখের আসর হতো জনজমাট।[১]

এককালে কথকতা ছিল লোকশিক্ষার অন্যতম বলিষ্ঠ মাধ্যম। কথকতার কথক ঠাকুর ছিলেন এই শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষক। এসম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, "একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি— সে দিনও ছিল - আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বেদী পিঁড়ীর উপর বসিয়া, ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস্ নাদুস্ কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণ বিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন।"[২]

আমাদের দেশে জ্ঞানোপার্জনের কতকগুলি উপায় ছিল, যা বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। কথকতা এর মধ্যে একটি। প্রাচীনেরা কথকের মুখে পুরাণ ইতিহাস শ্রবণ করতেন।

পুরাণ-ইতিহাসের মধ্যে উল্লিখিত/সংগুপ্ত অনন্ত জ্ঞান ভান্ডার থেকে তাঁরা সঠিক সত্য, পরিমার্জিত তথ্য ও নীতিবোধ জেনে পরিতৃপ্ত হতেন। কথক ঠাকুরেরা ছিলেন পুরুষ পরম্পরায় জ্ঞান বিতরণের বাহক। জাগতিক সত্য, জীবন ও জগতের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সব স্তরের মানুষের জ্ঞানদাতা ছিলেন কথকেরা। তাঁরা একাধারে ছিলেন শিক্ষক ও জ্ঞানী। সামাজিক মানুষের বিচার, বুদ্ধি, জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি সার্বিক উন্নতির কথা মাথায় রাখতেন। শাস্ত্র-পুরাণাদি অবলম্বনে উপস্থাপিত কথকতায় তাঁরা সংযোজন করতেন নানা নীতিকথা ও গল্পকাহিনি। কথকতা উপস্থাপনে ও এর বিষয় নির্বাচনে তাঁদের স্বাধীনতা ছিলো অনেক। সময়ের পরিবর্তনে কথকতায় সংযোজন বিয়োজনের মাধ্যমে এটিকে শিক্ষার মাধ্যম করে তুলেছেন তাঁরা।

কথকতা কথক-সৃষ্ট সাহিত্য। এই সাহিত্যে কথকের বিচরণ ভূমির ব্যাপ্তি অনেক। কথকতা পুরাণ ভাগবত ইতিহাসে বর্ণিত নানা কাহিনি উপকাহিনিকে ভর করে, সমাজ মানুষের চাওয়া-পাওয়ার কথা চিন্তা করে কথকদের দ্বারা সৃষ্ট শিল্প বিশেষ। কথকতা পরিবেশনের সময় ব্যাখ্যা, আলোচনা ভাষা ব্যবহার সবসময় এক নাও হতে পারে। একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে অঞ্চল ভেদে কথকের আলোচনা ও ব্যাখ্যার মধ্যে তফাৎ থাকাটা স্বাভাবিক। কথকের জ্ঞান, বুদ্ধি দর্শক শ্রোতার চাওয়া-পাওয়া ও মানব সমাজের হিত কামনা ও সমাজের দায়ের উপর কথকতার বিষয়ের ব্যাখ্যা ও আলোচনা হতে পারে। তবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ মানুষকে কেন্দ্র করেই স্থানভেদে কথকতায় আনন্দ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে শুভাশুভ, উচিত-অনুচিত, নীতিকথা ইত্যাদি প্রসঙ্গ জায়গা করে নেয়।

লোকসমাজে নৈতিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি ঘটেছে কথকতার দ্বারাই। বঙ্গদেশেও কথকদের দ্বারাই কৃষ্ণকথা, রামকথা, মহাভারত কথা ইত্যাদির প্রভাবে সমাজে নৈতিক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য, রামকথা বঙ্গদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে সব থেকে বেশি প্রভাবিত করেছিলো। আমরা অবগত যে বাল্মীকির রামায়ণ কাহিনির বিভিন্ন রূপ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ছিল। এইসব রূপ সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতেন কথকেরা। পর্ব, বিষয়, উপকাহিনি চরিত্রের উপস্থিতি প্রাদেশিক এই রামায়ণ কাহিনিগুলিতে এক না হলেও সবগুলোর পরিণতি ও নীতির সিদ্ধান্ত এক। প্রদেশ ভেদে, ভাষা ভেদে রাম কাহিনির মধ্যে এই পরিবর্তন কেনো? —কথকের প্রভাব নয় কী! —অবশ্যই; আঞ্চলিকভাবে প্রচলিত কথকতার আদলেই পরবর্তীতে রচিত হয়েছিলো সে অঞ্চলের রামায়ণ কাহিনি। বঙ্গদেশের প্রাচীন কথকগণও এই সমাজের লোককে রামকথার সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন। পরবর্তীতে এই পরিচয় পুষ্ট করেছে বঙ্গসংস্কৃতি ও সাহিত্যকে। তার প্রমাণ আমরা পাই লোকসমাজ সৃষ্ট লোককথা, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা ও লোকনাট্যে। প্রতিটি বিভাগেই রাম চরিত্রের যে পরিচয় আমরা পাই তা নিঃসন্দেহে

কথকতায় বর্ণিত রাম চরিত্রের প্রভাবে সৃষ্ট। 'দশপুত্তল ব্রত', 'ভাদুলী ব্রত', 'জন্ম রহস্য নির্ভর ধাঁধা', 'হিন্দু বিয়ের গীতের মঙ্গলাচরণ ও কণ্ঠিবদলের গীত', 'বিয়ের ছড়া', 'সংসার কেন্দ্রিক প্রবাদ' ইত্যাদিতে রাম, সীতা, লক্ষণ চরিত্রের যে পরিচয় আমরা পাই তা রামকথা নির্ভর কথকতারই ফসল। গ্রামের নিরক্ষর মানুষ কথকের মুখে রামকথা শুনে এসব চরিত্রকে নিজের ভাবনায় বিনির্মাণ করে নিজ পরিবারের সদস্য হিসাবে পরিচয় দিয়েছে। এর কৃতিত্ব বাংলার কথক ঠাকুরদের। লোকসংস্কৃতিবিদ্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত গবেষকগণ ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে যখন কোনো লোককথা সংগ্রহ করেন, তখন যাঁর কাছ থেকে লোককথাগুলি সংগ্রহ করেন তাঁর নামের আগে 'কথক' শব্দটি জুড়ে দেন। এই কথক শব্দের বিশেষণই কথকতা। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, মুখে মুখে সৃষ্ট ও মৌখিকভাবে প্রচারিত ও প্রসারিত হবার ক্ষেত্রে লোককথা-গল্পকথা কথকদের মুখ্য ভূমিকা অবশ্য স্বীকার্য। বাংলার শান্ত নির্জন পল্লীর কুটীরে বসে মা-ঠাকুমারা তাঁদের ছেলেপুলেদের যে সমস্ত সাতরাজার ধন, তেপান্তরের মাঠ, সোনারকাঠি রূপার কাঠি, রাক্ষস-খোক্ষস, দৈত্য-দানবের গল্প বলতেন তা তো আসলে কথকতাই।

কোন সময় থেকে কথকতার এই ধারা প্রচলিত তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। অনুমান করা যায়, মানুষ যেদিন কথা বলতে শিখেছে গল্প বলার ঐতিহ্য যেদিন থেকেই শুরু হয়েছে। অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক কালপর্ব থেকে কথকতার সূত্রপাত। লক্ষণীয়, কথক যখন কোনও গল্প পরিবেশন করেন তখন এককভাবে গল্পের সমস্ত পাত্রপাত্রীদের বর্ণনা করতে গিয়ে এক নাটকীয় আবহ তৈরি করেন। আবার গল্পে কোনও গান থাকলে তিনি সুর করে সেই গানও গেয়ে শোনান। এক আশ্চর্য দক্ষতায় সংলাপ-গান-বর্ণনা করে যান স্বতস্ফূর্তভাবে অনেকটা নাটকের একক অভিনেতার মতো।

সূত্রনির্দেশ :

১। দুলাল চৌধুরী, বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অফ ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১৪৪।

২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, লোকশিক্ষা (বিবিধ প্রবন্ধ), বঙ্কিম রচনাবলী, পৃ. ৮৮৯।

বাংলার লুপ্তপ্রায় লোকনাট্য : ঘাটু

।। এক।।

বাংলাদেশের হাওর অঞ্চল, পূর্ব ময়মনসিংহ, সিলেট, পশ্চিমবঙ্গের নদীমাতৃক অঞ্চল, ত্রিপুরার কিয়দংশের একটি বিলুপ্ত প্রায় আঞ্চলিক পল্লীসংগীত 'ঘাটু'। ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে এই গান গাওয়া হয় বলে একে ঘাটু গান বলা হয়ে থাকে বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। অঞ্চলভেদে এটি ঘাটু, গাঁড়ু, গাড়ু, গাটু, ঘাটু, গানটু ইত্যাদি নামে উচ্চারিত হয়ে থাকে। শব্দমূল বিচারে বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ আশরাফ সিদ্দিকী 'ঘাটু গান' এর মধ্যে 'ঘাট' আর 'গান' শব্দ দু'টিকে প্রধান মনে করেছেন।[১]

'ঘাটু' নামকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষক ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেন কৃষ্ণের বাঁশির ঘাট শব্দ থেকে 'ঘাটু' নামকরণ হয়েছে। এপ্রসঙ্গে যুক্তি দিয়ে বলা হয়েছে যেহেতু ঘাটু নামক নারীবেশের ছেলেকে মূলত গান ও নাচে বাঁশি নিয়ন্ত্রণ করে সেহেতু বাঁশির ঘাটের প্রভাবেই এর নাম 'ঘাটু'। 'ঘাটু', শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্যের অভিমত হল, নৌকার পাটাতনে ঘাটুগান ও নাচের আসর বসতো। ঘাটুর দল ঘাটে ঘাটে নৌকা লাগিয়ে নাচ গান করে জীবিকা নির্বাহ করতো। আবার অন্যদিকে, এই গানের বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। এই প্রেমলীলায় যমুনা ঘাটের লীলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উভয় দিকের বিবেচনায় 'ঘাটু' শব্দটির উদ্ভব 'ঘাট' শব্দ থেকে হওয়াই স্বাভাবিক। যতীন সরকার তাঁর 'সিরাজুদ্দিন কাশিমপুরী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে গুজরাটের নিম্নশ্রেণির লোকেরা সুদর্শন বালককে নাচ গান শিখিয়ে, মেয়েদের পোশাক ও অলংকার পরিয়ে নৃত্যগীতের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করতেন। এই ছেলেদেরকে 'গান্টু' বলা হয়ে থাকে। তাছাড়া সিরাজউদ্দীন কাসিমপুরীর মতে "গান্টু" নামে বালকদের নৃত্য-সংবলিত এক প্রকার গান বৃন্দাবন মথুরা থেকে গঙ্গার তীর ধরে রাজমহল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল; সে বিচারে গানগুলোর নাম 'গাঁটু', 'গাঁড়ু' হওয়াই স্বাভাবিক।"[২] —এ আলোচনা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে এই গান নদীমাতৃক অঞ্চলের। সে হিসেবে 'গান্টু' গানের সঙ্গে 'গাড়ু/ঘাটু' গানের সম্পর্কসূত্র রয়েছে। লোকশ্রুতি আছে যে সেই 'গান্টু' থেকেই 'গাটু' ও 'গাড়ু' শব্দের উৎপত্তি। করুণাময় গোস্বামী জানিয়েছেন যে, নেপালে

ঘাটু নামে এক ধরনের গানের প্রচলন আছে। অবশ্য নেপালের ঘাটু গান নারী-পুরুষের সম্মিলিত গান। এর সঙ্গে নদী এবং বালিকা-বেশী বালকের কোনও সম্পর্ক নেই।[৩]

ঘাটু গান ছিল বাংলার নিভৃত পল্লী অঞ্চলের গান। বঙ্গদেশের ভাটি এলাকা, বিশেষ করে হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার হাওর অঞ্চলগুলো সহ বিল, হাওর ও নদীর ঘাটে এসব গানের আসর বসতো। লোকমুখে শোনা যায়, ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে অধুনা বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার আজমিরিগঞ্জ উপজেলার জলসুখা গ্রামের বাউল আখড়ায় প্রথম ঘাটু গানের সূত্রপাত। এ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাটি হচ্ছে - জলসুখা গ্রামের বৈষ্ণবাচার্য উদয় দেব (মতান্তরে উদয় আচার্য) কৃষ্ণ প্রেমে বিবাগী হয়ে বিরহিনী রাধাবেশে কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় দিন কাটাতেন। ধীরে ধীরে অনেকেই তাঁর অনুগামী হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে কিশোরদের সাজানো হতো রাধার সখীর সাজে। সেসব সখীর সঙ্গে নেচে নেচে বিরহ সংগীত গাইতেন বৈষ্ণবাচার্য। তিনিই ঘাটু গানের প্রবর্তক। ক্রমে নারী বেশধারী এসব কিশোর ঘাটু হিসেবে পরিচিত হয় এবং এইসব কিশোরদের কেন্দ্র করে ক্রমে গড়ে ওঠে ঘাটুর দল। পরবর্তীতে সুন্দর সুন্দর কিশোরদের দলে ভর্তি করে তাদের লম্বা চুল রাখার ব্যবস্থা করে রীতিমতো তালিম দিয়ে আসরে ব্যবসার কাজে নিয়োজিত করা হলো। লোকসংস্কৃতিবিদ ওয়াকিল আহমদ জানান, "সিলেটের বিথলঙ্গের জগন্মোহন প্রবর্তিত 'কিশোরীভজন' নামে বৈষ্ণব উপসম্প্রদায়ে কিশোরীদের নিয়ে ভজন ও নাচের প্রচলন আছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা প্রভাবিত ঘাটু নাচগানে এই কিশোরীভজনের প্রভাব থাকতে পারে। বর্তমানে কিশোরগঞ্জ নেত্রকোনা হাওরের আধুনিক মঞ্চেও ঘাটুনাচ পরিবেশিত হয়।"[৪]

।। দুই।।

রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা ঘাটু গানের মূল উপজীব্য। গানগুলোতে রাধা বিরহের সুরই প্রাধান্য পেয়েছে। রাধা বিরহের কাহিনি গানগুলোতে থাকলেও এগুলো সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত। গানগুলো লৌকিক ও আদিরসকেন্দ্রিক। বর্ষাকালে জলে টুইটুম্বুর অঞ্চলের কর্মহীন মানুষ চিত্ত বিনোদনের জন্য ঘাটু গানের প্রতি আকর্ষিত হতো। ঘাটু গানের বিরহ বর্ণনা হাওরের সরলপ্রাণ মানুষের আবেগ-অনুভূতিকে ভীষণভাবে নাড়া দিতো। অনেকসময় আবার বর্ষাকালে জমিদারের উঠান, গ্রামের মোড়লের গৃহ প্রাঙ্গণ ও গ্রামবাসীদের যৌথ উদ্যোগে ঘাটুগানের আসর বসতো গ্রামের কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে। তবে প্রধানত বর্ষাকালে নদী-নালা, খাল-বিল যখন জলে পরিপূর্ণ তখন নৌকা গ্রামের ঘাটে ভিড়িয়ে গান পরিবেশন করা হতো। অনেকসময় একই জায়গায় একাধিক ঘাটুদলের আসর বসতো। তাদের মধ্যে বিশেষ করে রাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও গানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতাও হতো।

'ঘাটু' দল ১৪ থেকে ১৮ বছরের সুকণ্ঠী বালকদেরকে নিয়ে গঠিত হতো। এর মধ্যে

এক বা একাধিক সুদর্শন কিশোর ঘাটু আসরের কেন্দ্রীয় চরিত্র। দর্শক-শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করার জন্য এদেরকে একদিকে যেমন পোশাক-পরিচ্ছদ ও নারীদের প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবহার করে যুবতীসুলভ হতে হয়; ঠিক তেমনি ঘাটু বালকদের অঙ্গভঙ্গি, কণ্ঠ ও নৃত্য পারদর্শিতা নারীসুলভ হওয়া চাই। এ সম্পর্কে শাহিদা খাতুন লিখেছেন— ''ঘাটুদের সুকণ্ঠের অধিকারী, অল্পবয়সী এবং লম্বাকেশী হতে হয়। এদের যুবতীসুলভ রূপ-লাবণ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, সমধুর কণ্ঠ, অঙ্গভঙ্গি, নৃত্য প্রভৃতি দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।''[৫]

ঘাটু দলের প্রধান গায়েনকে বলা হয় 'সরকার'। পেশাদারী কিংবা শৌখিন ঘাটু দলের মালিককে 'খলিফা' বলা হতো। ঘাটু কিশোর, সরকার ও সংগীত শিল্পী ছাড়া দলের কিছু কিছু সদস্য অন্যান্য কাহিনিগত চরিত্রে অভিনয় করতো। দলের অনেক জন বাদক থাকতো। কোন কোন অঞ্চলে ঘাটুকে গানে সাহায্য করার জন্য দু'এক জন লোকের প্রয়োজন হতো। তাদেরকে স্থানীয় ভাষায় 'মরাধার' নামে সম্বোধন করা হতো। 'মরাধার' ঘাটু/ঘাটুদের সঙ্গে নেচে নেচে তাকে প্রশ্ন করতো এবং ঘাটুকে গানের মাধ্যমে এর উত্তর দিতে হতো। লোকসংস্কৃতির অনেক গবেষক এই পর্যায়ের সঙ্গে 'মালজোড়া' গানের প্রভাব লক্ষ করেছেন।

'ঘাটু' গানে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ঢোল, তবলা, বেহালা, সারিন্দা, মন্দিরা, বাঁশি, করতাল, হারমোনিয়াম প্রভৃতি ব্যবহার করা হতো। মুক্ত স্থানে, অনেক সময় নদীর ঘাটে, আবার বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে বৃহৎ নৌকার উপরেও এসব গানের আসর বসতো।

ঘাটু গানগুলো আকারে সংক্ষিপ্ত থাকে। আশরাফ সিদ্দিকী এ বিষয়ে বলেন,— ''গানগুলোও সংক্ষিপ্ত— দুই পদী বা তিন পদী। গায়কেরা এগুলোকে 'দোহারী' এবং 'তিহারী' বলেন।''[৬] তবে, লোকসাহিত্যের চিরাচরিত নিয়তিকে মেনে ঘাটুগানেও অনেক গানের পদ পাওয়া যায়। 'ঘাটু গীত' বিরহ-সংগীতের অশ্রুধারা দিয়ে তৈরি হলেও পরবর্তীকালে সমসাময়িক ঘটনাও এতে স্থান পেয়েছে। এ ধরনের গানের মূলত তিনটি পর্যায়— রংবাউলা, মুরলি ও বিচ্ছেদ। ঘাটুগানের তাল কোন নিয়মের মধ্যে বাঁধা থাকতো না। বন্দনা দিয়ে শুরু করে প্রেম, প্রেমতত্ত্ব, মান, অভিমান, বিচ্ছেদ, মিলন, সন্ন্যাস প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করে এগিয়ে যেতো তার গীতধারা। চিরায়ত বাংলার বিরহ বেদনার অসামান্য বর্ণনা মূর্ত হয়ে ওঠতো এসব গানে সুরের ইন্দ্রজালে।

লোকসংস্কৃতিবিদ ওয়াকিল আহমদ জানান, ''রাধাকৃষ্ণের কেবল প্রেমের অংশটুকুই ঘাটুগানের অংশীভূত। এর মোট চারটি ভাগ— রঙ্গিলা, মুরলী, জলভরা ও বিচ্ছেদ। এগুলির মধ্যে মুরলী ও বিচ্ছেদ অংশের প্রাধান্য বেশি। প্রত্যেকটি অংশ ছোট ছোট একপদী গানে বিভক্ত, যেমন - ভজন, সাজন, গৌর, বংশী, গোষ্ঠ, জলভরা, ফুলতোলা, কুঞ্জসাজান, নিদ্রা, স্বপন, কোকিল, বিচ্ছেদ, মধুমাস, সখী সংবাদ, সন্ধ্যা প্রভৃতি। এগুলিকে ঘাটুর 'ছম' বলে। ছমগুলি মূল গায়েন গায়। ঘাটু ছমের ভাবানুযায়ী নাচে। এজন্য ঘাটুগান ও ঘাটুনাচের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক।''[৭]

ঘাটুকে বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চলের গান বলে অনেকে অভিহিত করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে এসব গানের কিছু বিশেষত্ব ও নির্ধারণ করেছেন অনেক গবেষক। তাঁদের চিন্তাসূত্রকে অবলম্বন করে সেই বিশেষত্বগুলো আলোচনা করা যেতে পারে,— বালকদের পরিবেশনা : নারীর বেশ পরে সুদর্শন কিশোর বালক নৃত্য-গীতের মাধ্যমে ঘাটু গান পরিবেশন করে থাকেন। এটাকে তাই 'ছোকরাগান' বলা হয়। মেয়েলি চেহারার ছেলেকে ঘাগরি বা শাড়ি, ব্লাউজ পরিয়ে, কানে দুল, দু-হাতে রঙিল বেঁধে নৃত্য-গীত করতে হতো।

বংশ পরম্পরাগত পরিবেশক : যদিও এসব গানের শিল্পীরা প্রথম দিকে বংশ পরম্পরায় গেয়ে থাকতো, কিন্তু পরবর্তীতে ঘাটুর দলে সুদর্শী বালকদের বেতনভোগী কিংবা চুক্তি (আর্থিক লেনদেনে) করে অন্তর্ভুক্ত করা হতো।

বর্ষাকালীন পরিবেশনা : নদীমাতৃক অঞ্চলে এই গান বর্ষাকালে পরিবেশন করা হয়।

নৌকা সংশ্লিষ্ট পরিবেশনা : এই গানের আসর নৌকার পাটাতনের উপর বসতো। তবে নদীর ঘাটে, মুক্তস্থানে, উঠানেও এগুলো পরিবেশনার সাক্ষ্য মিলে।

ঘাটু গানের নৃত্য খুবই উপভোগ্য। অল্প বয়সী ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে সহজ নাচের মুদ্রা শিখিয়ে বাদ্যযন্ত্রের তালে বাঈজির নাচের মতো ঘাটুগানের অনুষ্ঠান হতো। ঘাটুনাচের অঙ্গভঙ্গি ছিলো দর্শক মনোরঞ্জনের প্রধান আকর্ষণ। নারীবেশের পুরুষ ঘাটুদেরকে উপস্থিত দর্শকরা খুচরা পয়সা দিয়ে পুরস্কৃত করতো। 'ঘাটু'-রাই ছিলো দলের মধ্যমণি। দর্শকদের আকর্ষিত করার জন্য বিশেষ ভঙ্গিতে ঘাটু আহ্বান জানাত—

আইও বন্ধু বইও পাশে
মুখে দিয়া পান
দেইখ্যা যাওরে ঘাটুর নাচন
পূর্ণিমার চান।

।। তিন।।

ঘাটু গান বিরহমূলক গান। রাধাবিরহই এর মূল বিষয়। লেটোগান, মালজুড়া ও কবিগানের সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক লৌকিক গানের পাশাপাশি এধরনের গানে অভিজ্ঞতালব্ধ সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার উপাদানও দৃষ্টিগোচর হয়। অবশ্য এগুলি পরবর্তীকালের সংযোজন।

ঐতিহ্যগত কিছু ঘাটু গান—

(১)

কি হেরিলাম যমুনায় আসিয়া গো
সজনী বনমালী তরুয়া মূলে।
যাইতে যমুনার জলে সেই কালা

কদমতলে ও রূপ চাইতে কলসী নিল স্রোতে।

(২)

মনতো মানে না-রে কালা
দিয়ে গেলি একি জ্বালা
চোখের দেখা প্রাণও সখা
দিয়ে যাবে নিঠুর কালা।

(৩)

আমার বন্ধু বিনোদিয়ারে শ্যাম বিনোদিয়া
মাতা ছাড়লাম পিতারে ছাড়লাম
ছাড়লাম সোনার পুরী
তোমার লাইগা পাগল হইয়া দেশ-বিদেশে ঘুরি।
আগে যদি জানতামরে বন্ধু যাইবারে ছাড়িয়া
দুই চরণ বান্দিয়া রাখতাম মাথার কেশ দিয়া
আমার বন্ধু বিনোদিয়ারে শ্যাম বিনোদিয়া।

(৪)

দুঃখে-কষ্টে আছে রে শ্যাম তোমার বিধূমুখী
দশম দশায় পড়িয়াছে মরণ কেবল বাকি
আমারে পাঠাইয়া দিল, যাবে কিনা যাবে বল
উন্মাদিনী হইয়া গেল সত্যযুগের লদী

(৫)

(কৃষ্ণের সুবলের প্রতি)
আমি যাইতেও পারি না, মনেও তো মানে না
যাব না সুবল আমি রাধার খবরে
দেখ সুবল তুমি চিন্তা করে
আমি তার প্রেমে পোড়া, পুড়লাম জনম ভরা।

(৬)

আমার মনের বেদনা
সে বিনে কেউ জানে না
কালা যখন বাঁজায় বাঁশি
তখন আমি রান্‌তে বসি

বাঁশির সুরে মন উদাসী
ঘরে থাকতে পারি না
আমার মনের বেদনা
সে বিনে কেউ জানে না।

(৭)

'কৃষ্ণ জন্ম নিলো বাসুকীর ঘরে
ছোটোকালে রাখাল কৃষ্ণ
লীলাখেলা করে।
পদমা ঘরে দেবতারা
দিলো রাধার জন্ম
যুবতী রাধিকার জন্মে
ভাগ্যে হইলো কী যে কর্ম।

অভিজ্ঞাতালব্ধ পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাশ্রয়ী ঘাটু গান—

(১)

নামনা নামনা কইন্যা
জলে নামে না
দুষ্টু লোকের মিষ্টি কথায়
কইন্যা ভুলো না।

(২)

ভাইছাব আমায় জলে ভাসা
সাবান আইন্না দিলায় না
সাবান আছে ঘরে পরে
তার পরোয়া কেবা করে।

(৩)

তুই আমারে চিনলে নারে
আমি তো রসের কমলা
বন্ধুর বাড়ি আমার বাড়ি
মধ্যে নলের বেড়া।

(৪)

শ্যাম-নারী তো বেইমানের জাতগো

তোর বাড়ি আর যাইমু না
রাই-পুরুষ তো বেইমানের জাতগো
আসবার কইলা আইলা না
পয়সার কথা কইয়ারে কইয়া
প্রেম করিল শুইয়ারে শুইয়া
পয়সা দিল না।

(৫)
ঘুমাইলা ঘুমাইলারে বন্ধু
পান খাইলায় না।
একবালিশে দু'টি মাথা
সুন্দর করিয়া কওরে কথা
ঘুমাইলা ঘুমাইলায় রে বন্ধু
পান খাইলায় না।
গাংগের কুলে সর্ষের ফুল
জাত কুল-মান গেলো রে
ছাড়ো ছাড়ো ছাড়ো বন্ধু
বান্ধি মাথার চুল রে ...
হইলো এ কি প্রাণ সখা
দুইজন তবু লাগে একা
প্রেমের নেশায় মনের বাগান
দুঃখে যায় নাচিয়া রে।
সুখে ছিলাম, ভালোই ছিলাম
বাপ-মায়ের ঘরেতে
বড়ো আশায় দিছিগো মালা
আমি তোমার গলেতে।
হইলো একি প্রাণ বন্ধুয়া
সুখের নগর যাইবো হিয়া
আবাদ করি সোনার ফসল
পরাণ ভরিয়া রে ... পরাণ ভরিয়া।

(৬)
দেখরে ইংরাজ লোকে
কি কল কৈরাছে

সাত-সাগর পাড়ি দিয়া
রাজ্য পাতাইছে।
জঙ্গল কাইট্যা সড়ক দিছে
সেই সড়কে তার বানাইছে।
দিনের খবর
ঘড়িত্ আইনাছে।

লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট গবেষক ড. আশরাফ সিদ্দিকী 'তেলেনা' নামে ঘাটু গানের একটি বিশেষ পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। উর্দু ও হিন্দির সংমিশ্রণে সৃষ্ট ঘাটু গানগুলিকে 'তেলেনা' বলা হয়।[৮]

এরকম একটি গান হলো —

পিয়ারী তোমকে পিত লাগাওয়ে
রুম ছুম্ তেলেনা গাওয়ে।
রুম ঝুমঝুম্ তেলেনা গাওয়ে
রুম ঝুম ঝুম তানা নানা নাছ নাছ ।

ঘাটু গানের সঙ্গে নৃত্যাভিনয় ও কথা থাকে বলে এটি লোকনাট্য হিসেবেও পরিগণিত। 'ঘাটু লোকনাট্য' আজ লুপ্তপ্রায়। বঙ্গদেশের জীবন ও সংস্কৃতি থেকে এটি প্রায় হারিয়ে গেছে এবং এরজন্য দায়ী করা হচ্ছে নৃত্য ও গীতের অশ্লীলতাকে।

সূচনাতে ঘাটু পূজার্চনার মতো পবিত্র ছিলো। রাধা-কৃষ্ণের লৌকিক প্রেম-বিরহলীলার বিষয়-আশয়ে লোকসমাজ বিনোদনের রসদ খুঁজে পেতো। কিন্তু এরপর থেকে ঘাটু গানে নানা কারণে অপসংস্কৃতির প্রবেশ ঘটে এবং কালের যাত্রায় বঙ্গ সংস্কৃতি থেকে হারিয়ে যায় ঘাটু নাট্যগীত। তাছাড়া এর পেছনে যে সমস্ত কারণ ক্রিয়াশীল ছিলো সেগুলো হলো —

- ঘাটু গানের প্রবর্তক হিসেবে লোকসমাজে মান্য উদয় আচার্যের মৃত্যুর কিছুদিন পর থেকেই গানকে বাণিজ্যিক করে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা শুরু হয়। আদিরসাত্মক কথাবার্তা চালু করে তখন থেকেই অনেক গান রচিত হতে শুরু হয়।
- বঙ্গদেশের নানা সামাজিক দুর্নীতি ঘাটু গানে অশ্লীলতার যোগান দিতে সাহায্য করে।
- ঘাটু বালকদের নিয়ে নানা ধরনের যৌন লালসা চরিতার্থ করতেন কিছু বিকারগ্রস্থ মানুষ। এরফলে সমাজে সমকামিতার মানসিকতা বেড়েছে; যা ধর্মপ্রাণ ও সংস্কৃতিবান বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ মেনে নিতে পারেননি।
- একসময় ঘাটুদের কেনাবেচা ও দর্শকদের কাছে নোংরাভাবে প্রদর্শন করা নিয়েও সমাজে সংঘাতের সৃষ্টি হতো। (চন্দ্রকুমার দে)
- ঘাটুর জন্য সুদর্শন বালকদের ওস্তাদ/খলিফা ও কিছু প্রভাবশালী লোকরা তাদের

পিতামাতার কাছ থেকে এক-দুই বছরের চুক্তিতে ক্রয় করে আনতেন। ঘাটু বালকদেরকে তাঁরা স্ত্রী-সন্তানদের থেকে বেশি কদর করতেন। এমনকি ঘাটু বালকদের সঙ্গে রাত্রি যাপনও করতেন। এনিয়ে পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে কলহের সৃষ্টি হতো। স্ত্রী-রা চোখের জল ফেলতেন নীরবে নিভৃতে। প্রভাবশালী সৌখিনদার ও ওস্তাদের স্ত্রীগণ ঘাটু বালকদের সতীনের সমমর্যাদা দিতেন। এর প্রমাণ আছে লোকমুখে প্রচলিত একটি গানে —

আইছে সতীন ঘেটুপুলা
তোরা আমারে বাইন্ধা ফেল
পূব হাওরে নিয়া।

এইভাবে একদিকে সমাজের বিকৃতমনা কতিপয় সম্পন্ন মানুষের জন্য এবং অন্যদিকে বিনোদনের নিত্যনতুন উদ্ভাবনের ফলে ঘাটুগান তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে বাংলার সংস্কৃতি থেকে ক্রমে লয়প্রাপ্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলাদেশের প্রখ্যাত কথাকার হুমায়ূন আহমেদ জাহির ওরফে কলমা নাম্নী এক ঘাটুর কাহিনি অবলম্বনে ২০১২ সালে 'ঘেটুপুত্র কমলা' নামের চলচ্চিত্রটি তৈরি করে বাংলার লুপ্তপ্রায় এই সাংস্কৃতিক ধারাটিকে অম্লান করে রেখেছেন।

সূত্রনির্দেশ :

১। ড. আশরাফ সিদ্দিকী, লোক সাহিত্য, ২য় খণ্ড, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৮৮।
২। প্রাগুক্ত পৃ. ৮৯।
৩। করুণাময় গোস্বামী, বাঙালির গান, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, ফাল্গুন ১৪১৯, পৃ. ২৫।
৪। বাংলাপিডিয়া দ্রষ্টব্য।
৫। প্রাগুক্ত।
৬। ড. আশরাফ সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৯।
৭। ওয়াকিল আহমদ, বাংলা লোকসংস্কৃতি, গতিধারা, ঢাকা, ৫ম সংস্করণ, ২০১২, পৃ. ৯৯।
৮। ড. আশরাফ সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৯।

- উল্লিখিত গানগুলো (ই-পেপার, প্রথম আলো ১৯ এপ্রিল, ২০১৯, ই-পেপার কিশোরগঞ্জ নিউজ, ২ জুন, ২০১৭, বাংলাদেশ, উইকিপিডিয়া ও অন্তর্জাল থেকে সংগৃহীত।

আলকাপ : রূপে-রূপান্তরে

।। এক।।

আলকাপ পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও মালদহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত একটি অন্যতম লোকনাট্য। নদীয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, পশ্চিম দিনাজপুর অঞ্চলেও এই নাট্যধারা প্রচলিত। রংপুরে এই লোকনাট্য 'বেনাকুশাইন' নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ছাড়াও বিহারের পূর্ণিয়া এবং ঝাড়খণ্ডের দুমকা জেলাতেও একসময় এই পালাগানটি জনপ্রিয় ছিলো। অধুনা বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, রাজশাহী জেলার লোকসমাজেও এর প্রচলনের প্রমাণ মিলে। এসম্পর্কে মহঃ নুরুল ইসলাম জানান, ''আলকাপের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার নামটি জড়িত। আলকাপ কিন্তু মুর্শিদাবাদের পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহেও অভিনীত হয়। বীরভূম জেলার রাজগ্রাম, সরারই, নলহাটী, বিহারের সাহেবগঞ্জ (সাওঁতাল পরগণা) জেলার মহেশপুর, বারহারোয়া, তিনপাহাড়, রাজমহল, পূর্ণিয়া জেলার বাঙলার সীমান্তবর্তী বাঙলা ভাষাভাষী এলাকা, রাজশাহী জেলার নবাবগঞ্জ, শিকাঞ্জ, কানসাট, ভোলাহাট, রহনপুর, আমনুরা প্রভৃতি এলাকায় এবং মালদহ জেলার সর্বত্র আলকাপ গান অভিনীত হয়। তাছাড়া দিনাজপুর, বর্ধমান, নদীয়া জেলার কোথাও কোথাও আলকাপের আসর বসে থাকে।''[১]

আলকাপ সম্পর্কে মণি বর্ধন লিখেছেন— ''আলকাপ পালাগানের প্রচলন মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায়। আলকাপ পালাগান গায় নিরক্ষর দরিদ্র শিল্পীরা। গম্ভীরার অনুরূপ শিববন্দনা ও শ্লেষাত্মক গানে পালা গাওয়া হয়। গানের পদ ও সুর অপেক্ষাকৃত অমার্জিত কথ্য ভাষায় রচিত। পালা যাত্রাগানের মত। গম্ভীরা গান হয় শিবমন্দির প্রাঙ্গণে। আলকাপ গান হয় মুক্ত মাঠে, শামিয়ানা বেঁধে।''[২]

এক অর্থে পালাগান, অন্য অর্থে এটি আবার লোকনাট্যও। পালাগানেরই একটি অঙ্গ আলকাপ। অনেকটা কবিগানের মতোই, বিভিন্ন আসরে এই গান গাওয়া হয়ে থাকে। এধরনের গানের প্রধান উপজীব্য হলো ছড়া ও গান। আলকাপ গানের দলগঠনের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, এটি অন্যান্য গানের দল থেকে একটু আলাদা।

'আলকাপ' আরবি শব্দ। ব্যঞ্জনাধর্মী এই শব্দটি 'আল' ও 'কাপ' শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। 'আল' শব্দের অর্থ হলো , কন্টক, কীলক, সীমানা ইত্যাদি এবং 'কাপ' শব্দটির অর্থ,

কৌতুককারী, ছদ্মবেশী, তামাসা, সঙ। 'কাপ' শব্দটির উৎপত্তি 'কাপট্য' থেকে। কাপট্য > কপট > কাপ; যার অর্থ ছদ্মবেশ বা কৌতুক। 'আলকাপ' শব্দটির অর্থ নিয়ে লোকসংস্কৃতি গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। শব্দটির অর্থ কারো মতে রঙ্গ-রসিকতা বা হাসি ঠাট্টার প্রহসন। আবার কেউ মনে করেন আলকাপ হলো রঙ্গধর্মী নকশা। বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট সাহিত্যিক (যিনি আলকাপ দলের সঙ্গে যুক্তও ছিলেন) সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মতে, ''আক্ষরিক অর্থে আলকাপ রঙ্গরসাত্মক নাটিকা হলেও শব্দটির সামাজিক অর্থ হলো রঙ্গব্যঙ্গাত্মক নাটিকা।''[৩]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মতে— ''আলকাপ-এর আল্ শব্দটি আহ্লাদের অপভ্রংশ। আহ্লাদ > আল্লাদ > আল্। এটি পুরনো বাংলা শব্দ। অধুনা অসংখ্য বাংলা প্রাচীন শব্দ লুপ্ত। 'আল' শব্দ বেঁচে আছে 'কাপ' অর্থাৎ নাটিকার সঙ্গে জোড় বেঁধে। 'আলকাপ' কথাটির প্রকৃত অর্থ আমোদপ্রমোদমূলক নাটিকা। তবে কথাটির প্রকৃত অর্থব্যঞ্জনা বিস্তারে এই অর্থ ও ব্যক্ত— 'ব্যঙ্গ রসাত্মক নাটিকা' বা 'রঙ্গরসাত্মক নাটিকা।''[৪] মুস্তাফা সিরাজের মতে আলকাপের উদ্ভব উত্তরবঙ্গে।

'আল' শব্দটি পৃথিবীর নানা ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। আরবি 'আল' অর্থ 'মস্তান', পার্শি ভাষায় 'লালবং', ''বাংলায় এর মানে দাঁড়ায় হল, তীক্ষ্ণ, কন্টক, ধারালো ইত্যাদি। ... কাপ কথাটি বোধহয় দেশি। অর্থ কৌতুককারী, ছদ্মবেশ, তামাসা, সং ইত্যাদি। আল ও কাপ দুটো মিলে সূক্ষ্ম তামাসা, ধারালো কৌতুক, রঙ্গব্যঙ্গ অর্থ পাওয়া যায়।''[৫] আলকাপ শিল্পীদের মতে, আলকাপ হলো বিদ্রূপাত্মক বা ব্যঙ্গমূলক অভিনয়রীতি। আল অর্থ 'হুল' এবং কাপ অর্থে কৌতুক বা প্রহসনকে বোঝানো হয়েছে। আবার বাংলা কথ্য ভাষার ভিত্তিতে 'আল' বলতে বোঝায় কাঁটা বিদ্ধকারী উপকরণ এবং সাহিত্যের পরিভাষায় এই শ্রেণির উপকরণকে বলা হয় ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ (wit)। অর্থাৎ আলকাপ হলো, রঙ্গ, ব্যঙ্গ, কৌতুক বিদ্রূপের মাধ্যমে লোক সমাজকে নানা বিষয় সম্পর্কে অবহিত করার এক বিশেষ ধরনের নাট্যকলা। আলকাপ-এর উৎপত্তি সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন — ''গম্ভীরা গানে বিষয়-বৈচিত্র্য যাহাই থাকুক না কেন ইহাতে প্রধানত শিব দেবতাটি লক্ষ্য থাকে বলিয়া এদেশে মুসলমান ধর্মের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা কেবলমাত্র হিন্দু কৃষক সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল। মুসলমান সমাজে ইহা (গম্ভীরা) কালক্রমে একটি স্বতন্ত্র রূপ লাভ করিল, তাহা আলকাপ গান বলিয়া পরিচিত। ইহা শিব বিষয়ক ইসলামী সংস্করণ মাত্র।''

আশুতোষ ভট্টাচার্যের এই অভিমত যথার্থ নয় বলেই আমাদের মনে হয়। কারণ আলকাপ যদি গম্ভীরার ইসলামী সংস্করণ হত তাহলে আলকাপে হিন্দু দেবদেবীর বন্দনা করা হতো না। এবং এতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাও অংশগ্রহণ করত না। অথচ আলকাপের স্রষ্টা বলে যিনি পরিচিত তিনি হচ্ছেন বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহি

জেলার বনমালী সরকার বা বোনাকানা আর ঝাঁকসুকে বলা হয় আলকাপের প্রাণপুরুষ। তাই আলকাপ 'শিব বিষয়ক ইসলামী সংস্করণ' নয়। এটি বাংলার হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী লোক সমাজের ঐতিহ্যিক সম্পদ। আলকাপ লোকনাট্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির। নিম্নোক্ত বন্দনা গীতটি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ —

নম বীণাপাণি জ্ঞানদায়িনী
শ্বেত শতদল কমলাবাসিনী
বীণা যন্ত্রধরা তুমি মা সপ্তসুরা
মুনির মনোহরা অজ্ঞান বিনাশিনী।
আমরা কজন মিলে নেমেছি আলকাপ দলে
স্থান দিও চরণতলে ওগো মা বাণাপাণি।

আলকাপ পরিবেশনার দুটি অংশ — প্রথমটি গান, পরেরটি ছড়া। গানে থাকে বিভিন্ন প্রাচীন কাহিনি, আর ছড়ায় বর্ণিত হয় সমকালীন ঘটনা। ছড়া কাটার ফাঁকে ফাঁকে গায়ক যে ব্যঙ্গ কৌতুক বা হাসির গান পরিবেশন করেন একে আলকাপের 'রঙ' বলা হয়। আলকাপের বিশেষ দিক হলো এর অভিনয় ও নাচ।

।। দুই ।।

আলকাপ ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিরপেক্ষ লোকনাট্য। এর অভিনয়ের নির্দিষ্ট কোনো সময় থাকে না। সাধারণত বর্ষাকাল শেষ হওয়ার পর অর্থাৎ বৃষ্টিপাত শেষ হলে বিশেষ করে দুর্গাপূজার পর থেকে শুরু করে ধান বপনের আগে পর্যন্ত (গ্রীষ্মকাল) নানা স্থানে আলকাপের অনুষ্ঠান হয়। কোন কোন অঞ্চলে আলকাপ এক মাস বা তারও বেশি সময় ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়।

গম্ভীরা, গাজনের মতো আলকাপ গানের পরিবেশনার ক্ষেত্রে ধর্মীয় পার্বণের কোন সংযোগ নেই। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মাবলম্বী শিল্পীরা যেকোনো উপলক্ষ্যে সাধারণ মানুষের কাছে লোকনাট্যটি পরিবেশন করে থাকেন। বঙ্গদেশ কৃষিনির্ভর। কৃষিকে ভর করেই এই অঞ্চলের লোকসমাজের জীবনাচরণের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এই সমাজে ধান কাটা শেষে ভাঁড়ারে উঠে যাবার পর মানুষের থাকে নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ। এই অবকাশের সময় থেকে শুরু করে জ্যৈষ্ঠ মাসে চাষের কাজ শুরু হওয়া পর্যন্ত সময়টা বঙ্গদেশে আলকাপ অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে অনুকূল। অতীতে এই অনুষ্ঠান সন্ধ্যায় বা মধ্যরাত্র থেকে পরের দিন সকালের অনেক বেলা পর্যন্ত চলতো; কিন্তু বর্তমানে দুপুর দুটো/তিনটে থেকে শুরু হয়ে রাত্র এগারোটার ভিতরে শেষ হয়। আবার অনেক অঞ্চলে সন্ধ্যা থেকে শুরু করে পাঁচ-ছয় ঘন্টার মধ্যে অনুষ্ঠানের সময়কে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়।

আলকাপের নাট্যদলে দশ থেকে বারো জন সদস্য থাকে। কোন কোন অঞ্চলে আলকাপ গানের পরিচালক বা রচয়িতাকে 'খলিফা' বলা হয়ে থাকে। তবে অধিকতর এলাকায় আলকাপ গানের রচয়িতা ও পরিচালককে 'ওস্তাদ' বা 'ছড়াদার' বলা হয়। দলটিতে যিনি ছড়া কাটেন, কাপ ও পালা রচনা করেন তাঁর পরিচিতি 'ছড়াদার' বা মাস্টার হিসেবে। এই মাস্টার/ছড়াদার/ওস্তাদের নামানুসারে আলকাপ দলটির নামকরণ করা হয়। 'ওস্তাদ' ছাড়া দলটিতে ছোকরা, কপ্যা, সাধারণ অভিনেতা, বাজনাদার, দোহারকি প্রমুখ শিল্পীরা থাকেন। আলকাপ লোকনাট্যের কাপ অংশে যিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেন তাঁকে 'কপ্যা বা সঙদার' বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার বহু জায়গায় কপ্যাকে বলা হয় 'লাব্বাড়'। যার অর্থ হলো কৌতুক বা ঠাট্টাকারী। 'ছোকরা' হলো আলকাপ দলের নারীবেশী পুরুষ অভিনেতা বা গায়ক। এধরনের ছোকরা দলে দুই বা ততোধিক থাকে। কোন কোন অঞ্চলে এদেরকে আবার 'নাচিয়া'-ও বলা হয়। অনুষ্ঠানটির 'খেমটা নাচ' অংশে ছোকরারা অংশগ্রহণ করে বলে তাদের অপর নাম 'খেমটি'।[৬] এই ছোকরা বা নাচিয়ার বয়স কত হবে? ঝঁকসু বলেছেন — 'কম বারো উপরে বিশ/তাতে একটু উনিশ বিশ।'[৭] ওস্তাদ, কপ্যা, ছোকড়া ছাড়া দলে বাজনাদার, গানের সঙ্গে সঙ্গে দোহার দেওয়া দোহারকি এবং সাধারণ অভিনেতা প্রমুখ থাকেন।

।। তিন।।

আলকাপ মূলত আদিরসের লোকনাট্য। অতীতে নাট্যটি আদিরসাত্মক ও অশ্লীল ভাবভঙ্গীতে পরিপূর্ণ ছিলো বলে রুচিশীল শ্রোতারা এধরনের অনুষ্ঠান এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ভাব, রস, বিষয় চেতনার অনেকটা পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় সর্বস্তরের মানুষ এর রস উপভোগ করে চলেছেন। এমনকি অনেক অঞ্চলে আলকাপ মঞ্চস্থও হচ্ছে। বঙ্গদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থানগত দিক থেকে আলকাপ দলের শিল্পীরা নিম্নবর্গের হিন্দু বা মুসলমান। অধিকাংশই দরিদ্র শ্রেণির। অনেক শিল্পী আবার নিরক্ষরও।

বঙ্গদেশে লোকমনোরঞ্জন ও শিক্ষামূলক এই অনুষ্ঠানের ইতিহাস কতটুকু প্রাচীন?, এই নাট্যধারার ওস্তাদ কে? কোন অঞ্চল থেকে এর উৎপত্তি? —এমন প্রশ্ন মনে উঁকি দেওয়া স্বাভাবিক। কেউ কেউ বলেন যে, আলকাপ লোকনাট্যের উদ্ভব, বিকাশ ও বিবর্তন ১৬০-১৭০ বছর এর বেশি প্রাচীন নয়। বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আলকাপ নাট্যের একটি বন্দনার গান উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, ষোড়শ শতাব্দী থেকে আলকাপ লোকসমাজে প্রচলিত ছিলো। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে আলকাপ দল কর্তৃক সর্বদা গাওয়া বন্দনা গীতটি এরকম, —

"জয় জয় মা সরস্বতী কী জয়

জয় জয় ভোলা মহেশ্বর কী জয়
জয় তানসেন কী জয়
জয় জয় ... ... ওস্তাদ কী জয়।"[৮]

শূন্যস্থানে ওস্তাদ অর্থাৎ খলিফা, যিনি লোকনাট্যটির রচয়িতা ও প্রযোজক তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয়। অনেকে মতপোষণ করেছেন যে, আলকাপ ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্টি নয়, ঝুমুর গানের বিবর্তিত রূপই আলকাপ। আলকাপ নাট্যের প্রখ্যাত শিল্পীরা ঝুমুর, গম্ভীরা, কবিগান ইত্যাদির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। এর ফলে আলকাপ যে এগুলোর দ্বারা কোনোভাবেই প্রভাবিত হয়নি এমনটাও সঠিকভাবে বলা যায় না। পূর্বোক্ত বন্দনাগীতটিতে ভোলা মহেশ্বরের যে বন্দনার প্রসঙ্গ আছে এর সঙ্গে গম্ভীরা ও কবিগানের শিববন্দনার সাদৃশ্য প্রমাণ করে।

সঠিকভাবে কোন এক নির্দিষ্ট স্থান থেকে আলকাপের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়েছে, এমন তথ্য আজও পাওয়া যায়নি। তবে এটা সর্বজনবিদিত যে মালদহ-রাজশাহী-মুর্শিদাবাদের বিস্তৃত এলাকায় অনেক শিল্পীর সমবেত সাধনায় আলকাপের বিকাশ ঘটেছে। আলকাপের সূচনাপর্বের ক'জন শিল্পী হলেন, পদ্মাপারের মকসুদ মোল্লা, বিমল কটা (মালদহ), বোনা কানা, রহিমপুরের সুবেদার বিশ্বাস (মালদহ), ভগবান গোলার সাধু সোভান, হাসুপুরের বসন্ত সরকার বা বসন্ত ধানুকি প্রমুখ। পরবর্তীতে ধনপত নগরের ঝাঁকসু ওরফে ধনঞ্জয় সরকার, নূরপুর এর সুধীর দাস, মোজ্জাম্মেল নৈমুদ্দিন, সিরাজ মাস্টার, গোবিন্দপুরের মনকির আলি, সবুল কানা প্রভৃতি শিল্পীবৃন্দ এই নাট্যরীতিকে কালে কালে সমৃদ্ধ করেছেন।

'আলকাপ, নাট্যরীতি এবং আর্ট থিয়েটার' শিরোনামে কথাকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায়, ১৯৮২ সালের ২১ আগস্ট। প্রবন্ধ পাঠে জানা যায়, তিনি ১৯৫০-১৯৫৬ খ্রিঃ পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বৎসর আলকাপ দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। কথিত আছে, তিনি ঝাঁকসুর আলকাপ দলে বাঁশি বাজাতেন। একসময় তিনি আলকাপের জগতে ওস্তাদ হিসেবে আবির্ভূত হলেন। তখন তাঁর সার্বিক পরিচিতি ছিল 'ওস্তাদ সিরাজ' বা 'সিরাজ মাস্টার' নামে। পরবর্তীকালে আলকাপ দলের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না অবলম্বনে রচনা করেন 'মায়ামৃদঙ্গ' নামক উপন্যাস (প্রকাশকাল মাঘ ১৩৭১)। আলকাপ দলের দুই ছোকরা শান্তি ও সুবর্ণ এবং ওস্তাদ ঝাঁকসুকে ঘিরে গড়ে ওঠেছে উপন্যাসের আখ্যান। এতে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের আত্ম লকাপ দলের সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছাপ সুস্পষ্ট।

গবেষক কুনালকান্তি ১৯৮০ খ্রিঃ অক্টোবর 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায় 'আলকাপের শতবর্ষে ঝাঁকসু' শীর্ষক প্রবন্ধে দাবি করেছেন যে, আলকাপের জন্মস্থান মালদহের রহিমপুর গ্রাম। তাঁর মতে, মালদহের একচক্ষু বোনাকানা আলকাপের আদি জনক এবং লৌকিক এই

নাট্যধারাটিকে জনপ্রিয় ও ঋদ্ধ করেছেন জঙ্গীপুর ধনপত নগরের ঝাকসু ওরফে ধনঞ্জয় মশাই। তাঁর গুরু ছিলেন বসন্ত সরকার। বঙ্গদেশে অসংখ্য আলকাপের দল আছে। এ মধ্যে কয়েকটি হলো, 'নৈমুদ্দিন আলকাপ', 'সুধীর দাস আলকাপ', 'চায়না পঞ্চরস' 'ঝাঁকসু আলকাপ দল' 'শিবশক্তি আলকাপ দল' ইত্যাদি।

।। চার ।।

একসময় আলকাপে পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাদ্যযন্ত্রের তেমন বাহুল্য থাকতো না। আলকাপ শিল্পী বোনাকানার সময়ে এতে বিশেষ কোনো পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার চোখে পড়তো না। শুধু রাজা ও জমিদারের ক্ষেত্রে ধুতি-পাঞ্জাবী কিংবা সার্ট-পেন্ট ভালো হলেই চলতো। কিন্তু যখন থেকে পেশাদারিত্ব বা বিনিয়োগের বিষয়টি ধীরে ধীরে গুরুত্ব পেতে শুরু হলো তখন থেকেই চরিত্রানুযায়ী মানানসই পোশাক সহ ঢাল, তলোয়ার ও অন্যান্য অস্ত্রসহ বিভিন্ন মুখোশের ব্যবহার শুরু হয়েছে। প্রামাণ্য তথ্য অনুযায়ী এই পরিবর্তন শুরু হয় ঝাঁকুসুর পরবর্তী সময় থেকে। তদুপরি চরিত্রকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য প্রসাধনী সামগ্রীর ব্যবহারও শুরু হয়েছে।

বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্বের হাত, ঢোল, জুরির জায়গায় স্থান নিয়েছে, করতাল, ঢোল, তবলা, সাইডড্রাম, বিউগল, ঝমঝমি, হারমোনিয়াম, কনসার্ট, বাঁশি, ইলেকট্রনিক গিটার, সিনথেসাইজার প্রভৃতি। মঞ্চ, আসর ও আলোক সজ্জায়ও আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। আলকাপ নাট্য পরিবেশনার সময় অতীতে মাটির উপর পাটি কিংবা চটি বিছিয়ে বৃত্তাকারে ও চতুর্ভূজাকারে দর্শকাসন বসতো এবং আসরের ফাঁকা মধ্যস্থানে আলকাপ দলের অভিনয় হতো। বর্তমানে অনেক অঞ্চলে স্থায়ী মঞ্চেও তা উপস্থাপন করা হচ্ছে। তাছাড়া আসরের চারিদিকে প্যাণ্ডেল করে, আলোকসজ্জায় সুসজ্জিত করে, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সাউণ্ড সিস্টেমের ব্যবহার করে এই লোকনাট্য মঞ্চস্থ করা হচ্ছে।

।। পাঁচ ।।

'আলকাপ' লোকনাট্যের অপর নাম 'পঞ্চরস'। অর্থাৎ এই লোকনাট্যের মূলত পাঁচটি স্তর। আসরবন্দনা, ছড়া, কাপ, বৈঠকী ও খেমটা পালা। এই লোকনাট্যটিতে পাঁচটি রস পরিবেশন হয় বলে এটিকে 'পঞ্চরস' বলেও অনেকে অভিহিত করেছেন। পঞ্চরসের সূত্রপাত মূলত ঝাঁকসুর হাত ধরে। আলকাপ উপস্থাপনের সময় যে ক্রম আমাদের চোখে পড়ে সেগুলো হলো —

প্রথমে শিল্পীরা এসে আসরে বসার পর যন্ত্রসঙ্গীত বাজান। যন্ত্রসঙ্গীত বাজানোর পর, সরস্বতী সহ নানা দেবদেবী, স্থানীয় পিরের, দীক্ষাগুরু, ওস্তাদের নামে জয়ধ্বনি দেন এবং এরপর আবার কিছুসময় যন্ত্রসঙ্গীত বাজানো হয়। যন্ত্রসঙ্গীতের পর বিভিন্ন দেবদেবীর

কাছে আশীর্বাদ ও প্রার্থনা করে আসর বন্দনা করেন। আসর বন্দনা গানটি 'ওস্তাদ' কিংবা কোনো 'ছোকরা' গেয়ে থাকেন। এরপর সব 'ছোকরা' সঙ্গীত ও নৃত্য সহযোগে বৈঠকী গান পরিবেশন করেন। বৈঠকীগানে ছোকরাদের লাস্য ও হাস্যময়ী অভিনয় দর্শকদের আপ্লুত করে। এধরনের গানে নানা বিষয় থাকলেও নারী হৃদয়ের প্রেমকথাই প্রাধান্য পায়। এরপর ওস্তাদ শিববন্দনা গেয়ে শোনান।

বৈঠকীগান শেষে হয় কাপ বা ফার্স। 'সঙদার' বা কপ্যা ছোকরাদের সঙ্গে প্রেমিক-প্রেমিকা কিংবা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে তুলে উভয়ের মধ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে নানা রঙ্গ তামাশা করে। এপর্যায়ে কপ্যা ও ছোকরাদের মধ্যে নানা বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য দলের ওস্তাদ মোড়ল বা বিচারকের ভূমিকায় অভিনয় করেন। 'কাপ' পর্যায় শেষ হলে শুরু হয় ছড়া কাটা। এই ছড়া কাটার শিল্পী কখনো ওস্তাদ আবার কখনো বা দলের অন্যান্য শিল্পীও হতে পারেন। সামাজিক, রাজনৈতিক দেবদেবীমূলক কিংবা পারিপার্শ্বিক বিষয় নিয়ে এই ছড়াগুলো রচিত হয়। যেমন— ঐতিহাসিক বিষয় সম্পর্কিত আলকাপ পালা, কৃষক আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ; সমাজ সমস্যামূলক আলকাপ যৌতুক, মাদক, দুর্নীতি বিষয়ক আলকাপ; ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কিত আলকাপ— মনসা-চণ্ডীর কাহিনি, মহরমের বিয়োগান্তক ঘটনা; শিল্পকেন্দ্রিক আলকাপ রেশমশিল্প, কুটির শিল্পের বর্ণনা; বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচিতিমূলক আলকাপ— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, শেখ মুজিবুর রহমান— ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে গড়ে তোলা হয় আলকাপ পালা। লোকনাট্যটির সর্বশেষ পর্যায় 'পালা' কিংবা 'খেমটা পালা'। পালার বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে এই পর্যায় আধঘন্টা থেকে আড়াই ঘন্টা পর্যন্ত পরিবেশন হতে পারে।

এখানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা জরুরি যে আলকাপ লোকনাট্যের এই পর্যায়গুলো অঞ্চলভেদে ভিন্ন হতে পারে। তাছাড়া এই নাটকের ভাষা বঙ্গদেশের উপভাষিক বিভিন্ন অঞ্চলে , সেই অঞ্চলের প্রচলিত লোকসমাজের ভাষার উপর নির্ভর করে হয়ে থাকে।

।। ছয় ।।

আলকাপের আঙ্গিক প্রথমদিকে ছিলো শুধুমাত্র 'কাপ' বা 'নক্সা'। অতীতে পালার বিষয় ছিলো পারিবারিক বিরোধ, সতীনদের ঝগড়া, কোন বিশেষ মুদ্রাদোষ ইত্যাদি। পরবর্তীকালে আসরবন্দনা, বৈঠকী গান, ছড়াগান, কাপ, পালা ইত্যাদি আঙ্গিক নিয়ে আলকাপ উপস্থাপিত হচ্ছে। বিভিন্ন দেব-দেবীর বন্দনা, ওস্তাদ কিংবা দেশবন্দনা এতে পরবর্তীতে সংযোজন ঘটেছে। বন্যা, খরা, সামাজিক নানা অভিযোগ, অধ্যাত্মভাব ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করেও আলকাপের ছড়া-গান রচিত হয়েছে। তাছাড়া আলকাপের বিষয়

হিসেবে নিত্যনতুন নানা পারিপার্শ্বিক ঘটনা জায়গা করে নিয়েছে। অধুনা বাংলাদেশের 'রাজশাহী' জেলার একটি আলকাপ লোকনাট্যের বৈঠকীগান পর্যায়ের দু'টি গীত তুলে ধরা হলো যেখানে নারীহৃদয়ের প্রেম, বিরহ ও বেদনার কথা ফুটে উঠেছে,—

(১) নতুনও যৌবন জ্বালা
সহিতে না পারি গো
বিয়ে কেনো আমার
হইলো না ..... (ধূ)
চেপে উঠে প্রেমজ্বালা
চেপে ধরি কলসির গলা
হায়রে পিতলের কলস
কথা কেনো বলে না
বিয়ে কেনো আমার হইলো না

(২) ও নিষ্ঠুর কালার সনেরে
কেন বা পিরিতি করলাম রে
কে বাঁশি বাজালো রে
দুপুর বেলায় ..... কদমতলায়
শাশুড়ি ননদী ঘরে
প্রেমো দরজা খুলা রে
আসবো বলে , গিয়াছো চলে
পিছের দুয়ার খুলা রে
ও নিষ্ঠুর কালার সনেরে
কেন বা পিরিতি করলাম রে।

(অন্তর্জাল থেকে সংগৃহীত)

উল্লেখিত হয়েছে যে 'কাপ' পর্যায়ে কপ্যা ও ছোকরাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দেখিয়ে উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে নানা রঙ্গ-তামাশা ও দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে 'কাপ' রচিত হয় এবং সেই কাপগুলো সংলাপ, গীত ও অভিনয়ের মাধ্যমে চরিত্ররা দর্শকের সম্মুখে হাজির করেন। এই পর্যায়ে দলের ওস্তাদ স্বামী-স্ত্রী কিংবা প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে চলা দ্বন্দ্বের সমাধানের ক্ষেত্রে মোড়লের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

'রাজশাহী' অঞ্চলের আলকাপ লোকনাট্যের 'কাপ' পর্যায়ে তেমন উদাহরণ বিদ্যমান যেখানে এক স্ত্রী তার স্বামীর অকৃতকর্মতা ও তাঁর জীবনের দুঃখের কথা মোড়ল 'নানা'কে বলতে শুনা যাচ্ছে।

স্ত্রীর কণ্ঠে 'কাপ' ও ছড়া

"শোনো নানা ভাত খাব না তুমার নাতির আর ভার কাপড় আর লাকড়ি কড়ি লায় না জোগাড় রানাতে যদি দেরি হয় পিঠে ভাংগে লাঠি মার খাইয়া খাইয়া নানা-শরীর হইলে মাটি।"

স্ত্রীর অভিযোগে স্বামীও নানাকে অভিযোগ করে বলছে,—

স্বামীর কাপ ও ছড়া

"আরে ওরে তোরে বুঝি ধরেছে ভূতে তা নাহলে বিবাদ কেনো করবি মোর সাথে। একলা বাড়ির একলা নারীর খানির কত সুখ শাশুড়ি নাই, ননদী নাই, নাইতো জ্বালা দুখ। একটা বইন রইয়াছে আমার আছে অনেক দূরে আনার কথা শুনলে নানা জ্বলে পুড়ে মরে। ওই মুখে মুখে তর্ক করিস্ এই যে তুই নারী যা বাড়ইয়া জল্দি করিয়া থাকুক আমার বাড়ি।"

আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার বিবর্তন ধারায় আলকাপের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম বড়োই কঠিন হয়ে পড়েছে। তবুও বর্তমানে 'আলকাপ পঞ্চরস অপেরা', 'আলকাপ পঞ্চরস', 'পঞ্চরস অপেরা' নাম নিয়ে আলকাপ পালার ওস্তাদরা নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। পারিপার্শ্বিক নানা বিষয়বস্তু, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সম্প্রীতিবোধ সৃষ্টি, রাজনৈতিক কুকর্ম ইত্যাদি বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে নবেদ আলী, করুণাকান্ত হাজরা, শ্যামচাঁদ সহ অনেক শিল্পীরা আজও পালা, কাপ, ছড়া রচনা করে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখে চলেছেন।

সূত্রনির্দেশ :

১। মহঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামীণ লোকনাটক আলকাপ (পঞ্চরস), সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ২৩-২৪।

২। মণি বর্ধন, বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ, পুনর্মুদ্রণ ২০০৪, পৃ. ১৬৭।

৩। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মুসলিম চিত্রকলার আদিপর্ব ও অন্যান্য, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪০০, পৃ. ৪৯।

৪। সৈয়দ খালেদ নৌমান আলকাপে 'ওস্তাদ' ছিলেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ০১ অক্টোবর ২০১৮।

৫। হরিপদ চক্রবর্তী, মধুপর্ণী, মালদহ জেলা সংখ্যা, ১৩৯২, পৃঃ ৭৭।

৬। মহঃ নুরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫।

৭। প্রাগুক্ত, পৃ.২৫।

৮। রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আলকাপ উৎপত্তি থেকে সম্প্রতি, গণনাট্য, বত্রিশ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৯৬, পৃ. ৬৬।

গম্ভীরা : প্রসঙ্গ ও পরিচিতি

উৎপত্তি ও নামকরণ

অবিভক্ত বঙ্গদেশের জনপ্রিয় একটি লোকনাট্য গম্ভীরা। গম্ভীরা মূলত মালদহ অঞ্চলের জাতীয় উৎসব। গম্ভীরা নামকরণের পেছনে বিশেষজ্ঞ মহলে বিতর্ক বর্তমান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মালদহ অঞ্চলের পাশাপাশি বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলে এই লোকনাট্যের প্রচলন দেখা যায়। ধারণা করা হয় যে গম্ভীরা উৎসবের প্রচলন হয়েছে শিব পূজাকে কেন্দ্র করে। কারো কারো মতে 'গম্ভীরা' হলো শিবের আরেক নাম এবং শিবের পূজা ও উৎসবই পরবর্তীতে গম্ভীরা নামে পরিচিত হয়েছে। হরিদাস পালিত উক্ত মতামতকে মেনে আরো একটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের অবগত করিয়েছেন; তা হলো— "গম্ভীরা শব্দে যখন শিবমন্দির ও দেবস্থান বুঝাইতেছে, তখন শিবাদির পূজা গম্ভীরাতেই হইত। শিবোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইত। এদেশের লোকে গম্ভীরায় শিবের পূজা করিত। কালক্রমে উক্ত গম্ভীরার শিবোৎসব গম্ভীর পূজা নামে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বে শিবালয় গম্ভীর বা পঙ্কজ দ্বারা শোভিত হইত।"[১] কৃষিদেবতা শিবের মন্ডপ ও সংলগ্ন অঙ্গনের নামেই গম্ভীরা নামকরণ বলে আবার অনেক লোকসংস্কৃতিবিদ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। বাংলা অভিধান ও শব্দকোষের মতে গম্ভীরা শব্দের অর্থ হলো গাজনের উৎসব, শিব আরাধনার অনুষ্ঠান, দেব মন্দিরের অভ্যন্তর ইত্যাদি। গম্ভীর অর্থাৎ পদ্মফুল দ্বারা এই গানের ধর্মীয় আসর ও অনুষ্ঠানকে সাজানো হতো বলে গম্ভীরার সঙ্গে এর সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন অনেকে। বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে,— "গম্ভীরা শব্দটি এসেছে 'গামার' শব্দ থেকে। গামার হলো একপ্রকার অরণ্যজাত বৃক্ষ। শিবপূজা বা আরাধনার সময় শিবকে বসাবার জন্য যে কাঠের পীড়ি দেওয়া হত তা গামার কাঠ থেকে তৈরি। তাই এই গামার শব্দ থেকে শিবোপাসনার নাম গম্ভীরা হতে পারে।"[২] তাই, গম্ভীরার সঙ্গে শিবের যে সম্পর্ক কিংবা শিবকে কেন্দ্র করেই যে গম্ভীরা উৎপত্তি এতে কোন সন্দেহ নেই।

মূলত গম্ভীরা ছিল শিবোপাসনা বা শিবের পূজা অনুষ্ঠান। যাকে আমরা গাজনের একটি ধরনও বলতে পারি। অতীতে চৈত্র সংক্রান্তির চারদিন আগে থেকে নানা আচার অনুষ্ঠান ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে ধর্মীয় শ্রদ্ধায় ও নীতিনিয়মে গম্ভীরা অনুষ্ঠানটি পালিত

হত। কিন্তু কালচক্রের আবর্তনে গম্ভীরা অনুষ্ঠান থেকে ধর্মের আচার অনুষ্ঠান লুপ্ত হতে শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে গম্ভীরার রঙ, রূপ ও আঙ্গিকে অনেকটা পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গম্ভীরা নামক অনুষ্ঠানে যে গান গাওয়া হয় তাকে গম্ভীরা গীত বলে।

কালক্রমে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নৃত্য গীত থেকে একদিকে যেমন গম্ভীরাকেন্দ্রিক লোকসঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে, ঠিক তেমনি তার সঙ্গে পরবর্তীতে ছোট ছোট কাহিনি ও অভিনয় যুক্ত হয়ে নাট্যগুণ সমন্বিত গম্ভীরা পালাগানের সৃষ্টি হয়েছে, যার সঙ্গে আদি গম্ভীরা পূজার তফাত লক্ষিত হয়।

গম্ভীরার অঞ্চল ও মধ্যস্থান বা আসর

পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার হিন্দু সমাজে গম্ভীরা লোকনাট্যটি নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উৎপত্তি হয়েছে। অবিভক্ত মালদহের সব অঞ্চলেই গম্ভীরা পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হত। মুর্শিদাবাদ জেলায়ও এর প্রচলন অল্পবিস্তর চোখে পড়ে। ভারত বিভক্ত হওয়ার পরবর্তী সময়ে গম্ভীরা বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলে বিস্তৃত হয় এবং ক্রমে নবাবগঞ্জ, নওগাঁ প্রভৃতি স্থানে এ গান জনপ্রিয় হয়ে উঠে। সেই সময় থেকে এ গানের পৃষ্ঠপোষক হয় বাঙালি মুসলমান সমাজও। তখন স্বাভাবিক ভাবেই গানের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন সাধিত হয়।

অতীতে শিব মন্দির সমুখস্থ অঙ্গনকে সাজিয়ে আলোর ব্যবস্থা করে ১২ ফুট - ১৬ ফুট ব্যাসযুক্ত গোলাকার অংশে গম্ভীরা শিল্পীদের জন্য আসর তৈরি করা হত। আসরে বসার জন্য চট, শতরঞ্জি এসব পাতার ব্যবস্থা থাকতো না। ধুলোতেই নাচ-গান হতো, ধুলোয় বসে দেখা হতো। গম্ভীরা শেষে ভক্তদের মধ্যে 'ধুলো খেলার'ও রীতি প্রচলিত ছিল। তবে পদ্মফুলে গম্ভীরা মন্ডপ সাজানোর প্রামাণ্য তথ্য শুরু থেকেই ছিল। কোনো কোনো স্থানে মন্ডপের চারদিকে লোহার পিলসুজে বড়ো চারটি প্রদীপ জ্বলত। লণ্ঠন, ঝাড়, দেওয়ালগিরি, মোমবাতি, আয়না নানা ধরনের পট আসরের চতুর্দিকে রাখা হত।

পরবর্তীকালে সতেজ পদ্মফুলের অভাবে কাগজের পদ্মফুল তৈরি করে আসর সজ্জা শুরু করা হয়। বাদ্যকার ও কুশীলবরাই এখন শুধু আসরে থাকেন। অন্যান্য অভিনয়কারীরা নিকটবর্তী সাজঘর থেকে প্রয়োজন মতো আসরে এসে চরিত্রাভিনয় করে থাকেন। বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার এখন এই অনুষ্ঠানে বেশি পরিলক্ষিত হয়।

গম্ভীরার বাদ্যযন্ত্র, পোশাক, ভাষা ও সংলাপ

অতীতে যদিও গম্ভীরা পালাগানে শুধু ঢোল ও কাঁসি ব্যবহৃত হত কিন্তু পরবর্তীতে করতাল, তবলা, ঢোলক, বাঁশি, হারমোনিয়াম, ডুগি, মন্দিরা, জুরি ইত্যাদির ব্যবহার হতে শুরু হয়। অনেক সময় এই বাদ্যকারগণ দোহারির ভূমিকাও পালন করেন।

গম্ভীরা পালাগান যেহেতু সাধারণ লোকসমাজের বিষয়কে কেন্দ্র করে অভিনীত হয়

এবং সাধারণ মানুষের সচেতন প্রতিবাদী মানসিকতাই এতে পরিলক্ষিত হয়। তাই পা
অনুসারে পালাগানটিতে শিল্পীদের সাধারণ সাজ-পোশাক পরিধান করতে দেখা যা
সাধারণ গ্রামবাসীদের চরিত্রে অভিনয়ের সময় জীর্ণ পোশাক-আশাকই পরিধেয় থা
শুধু বন্দনা পর্যায়ে ত্রিশূল, বাঘছাল ও ডম্বরুধারী হয়ে একজন শিবচরিত্রে অভিনয় কর

লোকনাট্যের ভাষা অঞ্চলনির্ভর। তাই এই পালাগানের ভাষায়ও আঞ্চলিক মৌ
ভাষার প্রভাব দৃষ্ট হয়। বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলে একদিকে যেমন সেই অঞ্চল
মৌখিক ভাষার প্রভাব গীতগুলোতে লক্ষ করা যায়, ঠিক তেমনি মালদহ অঞ্চ
নানা জাতি-উপজাতির ভাষার সংমিশ্রণে লোকনাট্যটিতে ভাষার মিশ্ররূপ পরিলক্ষিত হ
মালদহের লোকনাট্যে হিন্দি, খোট্টাই, মৈথিলি, রাজবংশি, পলিয়াদের ভাষার প্রভাব আ

গম্ভীরায় গানের পরিপূরক ভূমিকার জন্য আছে গদ্য সংলাপের ব্যবহার। কো
কোনো গানে গীতি সংলাপেরও ব্যবহার লক্ষিত হয়। গীতি অংশ পূর্ব-প্রস্তুত হলে
চরিত্র অভিনেতাদের সংলাপ সম্পূর্ণ তাৎক্ষণিক। তাৎক্ষণিক সংলাপগুলি বেশ চটু
তাৎপর্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয়। উপস্থিত বুদ্ধির চমৎকার প্রয়োগ করে অভিনেতারা সংলাপে
মাধ্যমে আসরকে মোহিত করে তুলেন। বিভিন্ন অনুষঙ্গে সংলাপের শব্দের বৈচিত্র্য
দেখা যায়। কখনও লঘু শব্দ সিরিয়াস হয় আবার সিরিয়াস শব্দ লঘু রূপ পায়। ইংরেজি
শব্দকে ভেঙে, বিকৃত উচ্চারণ করে কথক ইচ্ছাকৃত মজা করেন। এমন অপব্যাখ্যা কখনে
দর্শকের কাছে হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়ায়। যমক ও শ্লেষের ব্যবহারে আসর হয়ে উ
জমজমাট। তবে পালাগানের প্রধান সংলাপের বেলায় পূর্ববর্তী কিছুটা বোঝাপড়া থাকে
অনেক সময় প্রতিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনে কথোপোকথনের সঙ্গে চুটকি গল্পও বলা হয়
এতে অনেক লোকগল্প গম্ভীরার আসরে বিশেষ মাত্রা পায়।

গম্ভীরা পালার পর্যায়

সাধারণত গম্ভীরা গান দুপ্রকার। একটি হলো আদ্যের গম্ভীরা, অন্যটি পালাগম্ভীরা।
আদ্যের গম্ভীরায় দেবদেবীকে সম্বোধন করে মানুষ তাঁর সুখ দুঃখ পরিবেশন করেন।
আবার অন্যদিকে পালাবদ্ধ গম্ভীরায় একজন বক্তা জনসাধারণের বক্তব্য অভিনয়ের মাধ্যমে
তুলে ধরেন। অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলে এই পালা-গম্ভীরায় নানা-নাতির
ভূমিকায় দুজন ব্যক্তির অভিনয়ের মাধ্যমে সামাজিক নানা সমস্যা তুলে ধরা হয়।

আদিতে গম্ভীরা ছিল শুধু গান। কালক্রমে এর সঙ্গে সংলাপ যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে
গান ও সংলাপের মিশ্রণেই গম্ভীরা অনুষ্ঠান। আজ থেকে আনুমানিক একশো বছর আগে
গম্ভীরা লোকসংগীত থেকে লোকনাট্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা
পালন করেছেন হরিদাস পালিত, বিনয় সরকার প্রমুখ।

এই লোকনাট্যের কয়েকটি পর্যায় আছে। সেগুলো হলো— (ক) মুখপাদ (খ) বন্দনা
(গ) ডুয়েট বা চারইয়ারী (ঘ) পালাবন্দী গান (ঙ) রিপোর্ট।

গম্ভীরার গানগুলো কখনো একটানা গীত হয় না। বর্ণনীয় বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে
গানের বিশেষ বিশেষ অংশ একাধিকবার গীত হয় এবং মধ্যে থাকে সংলাপের ব্যবহার।
গম্ভীরা গান মূলত আঞ্চলিক সংগীত হলেও এটিতে পালা-পর্যায় সংযোজিত হওয়ার
পূর্বপর্যন্ত এটি একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলো। সেই অনুষ্ঠানটি হলো
শিবের গাজন। গানগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এইগুলি শিবঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে রচিত।
সমসাময়িক ঘটনার মধ্যে এগুলোর বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ থাকে বলে এগুলোতে সাহিত্যগুণ
কিছুই থাকে না। কাব্যিক গুণ, ভাবের গভীরতা, রচনার পরিপাট্য গানগুলোতে খুঁজে
পাওয়া যায় না। "গানগুলি সকলই সাময়িক ঘটনামূলক। প্রধানতঃ সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে
ইহা বর্ষ বিবরণী পর্যালোচনা মাত্র। চৈত্র সংক্রান্তির দিন বৎসরের ঘটনাবলীর একটা হিসাব
নিকাশ লওয়া হয়,— তাহাতে প্রধানত সমাজের অভাব অভিযোগের কথাই বিশেষভাবে
প্রকাশ পায়।"[১] ছোটো-বড় সব কিছুই এই গানের বিষয়বস্তু হতে পারে। ব্যক্তিগত
দুঃখ, নিন্দামন্দ, রাজনৈতিক, সামাজিক বিষয়কে নিয়ে শ্রমজীবী, কৃষিজীবী সাধারণ মানুষ
শিবের কাছে গানের মাধ্যমে নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা নিবেদন করেন। গম্ভীরা গানের
বিষয়বস্তুর পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। গম্ভীরা গানের বিষয়বস্তুর একটি রূপরেখা পুষ্পজিৎ
রায় আমাদের অবগত করিয়েছেন। সেগুলো হলো,—

(১) **সামাজিক** —
- (ক) ব্যক্তিগত, পারিবারিক।
- (খ) নৈতিক
- (গ) জাতি-ধর্ম বর্ণবিশেষ।

(২) **রাজনৈতিক** —
- (ক) জাতীয়
- (খ) আন্তর্জাতিক
- (গ) স্থানিক
- (ঘ) রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক নেতাকর্মী।

(৩) **প্রশাসনিক** —
- (ক) পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ, মিউনিসিপ্যালিটি, বিধানসভা, লোকসভা ইত্যাদি।
- (খ) বি.ডি.ও, এস.ডি, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পিওন থেকে শুরু করে সার্বোচ্চ পদাধিকারী।
- (গ) এম.এল.এ., এম.পি, প্রধানমন্ত্রী, সচিব ইত্যাদি।

(৪) **প্রাকৃতিক** — বন্যা-খরা, ঝড়-ভূমিকম্প ইত্যাদি।

গম্ভীরাগানের বিষয়বস্তু নিরপেক্ষ থাকে। গানগুলোতে নানা মত, মানসিকতা ও কর্মের

ত্রুটিগুলি সমালোচিত হয়ে থাকে। জনমনে লোকশিক্ষার মানবৃদ্ধি ও সমাজ সচেতনতার লক্ষ নিয়ে এগুলি গীত হয়। আবার অন্যদিকে নিরক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত দরিদ্র লোকেরা গম্ভীরা গানের মাধ্যমে সমাজের নানা প্রতাপী চরিত্রের সমালোচনা ও প্রতিবাদ করার সুযোগ পায়। বিভিন্ন সুরের সংমিশ্রণে গাওয়া হয় গম্ভীরা গান। তবু কালের বিবর্তনে একটি বিশিষ্ট সুর সে তৈরি করে নিয়েছে। অনেকের মতে, আলকাপ, রামপ্রসাদী, বাউল, কীর্তনের সংমিশ্রণে গম্ভীরা সংগীতের উদ্ভব। একতাল, ঝাপতাল, খেমটা, ত্রিতাল, কাহারবা প্রভৃতি তাল মূখ্যত এই ধরনের গানের সঙ্গে বাজাতে শোনা যায়।

পালাগানটির প্রথম পর্যায় 'মুখপাদ'। এ পর্যায়ে পালাগানটির প্রত্যেক চরিত্র গানের মাধ্যমে এসে নিজ নিজ পরিচয় দিয়ে থাকেন। পরিচয় পর্বের দু'টি অংশ। একটি 'ধুয়া'- যেখানে আড়াই ফের গান হয়, অন্যটি 'চিতানী' —যেখান দুই ফের গান। সে সময় তবলার বিভিন্ন বোল (তাল) ও বাজানো হয়ে থাকে।

'মুখপাদ' পর্যায়ের পর বন্দনা অংশ। এই অংশে মহাদেব সেজে একজন আসরে অবতীর্ণ হন। তাঁর পরিধানে থাকে বাঘের ছাল, হাতে ত্রিশূল, মাথায় জটা ও বাঁহাতে ডম্বরু। এই শিবকে উদ্দেশ্য করে পালা গানের অন্য চরিত্রগুলি নানা অভিযোগ ও তাদের মতামত তুলে ধরেন। পণ্ডিতদের মতে, মহাদেব অর্থাৎ শিব এখানে রূপকার্থে উপস্থিত হন এবং তিনি 'ফিউডাল লর্ড'। পালাটিতে তিনি সরকার। শিবকে দেশের দুর্দশা জানানোর এবং অভিযোগ তুলে ধরার পর শিব সকলকে আশ্বস্ত করেন এবং অন্তর্হিত হন। কখনো কখনো বন্দনা অংশে কার্তিক বন্দনার প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন অনেকে।

'ডুয়েট বা চার-ইয়ারী' গম্ভীরা গানের এক তাৎপর্যপূর্ণ পর্যায়। এ পর্যায়ে একদিকে যেমন একজন নারী ও একজন পুরুষ চরিত্রের উপস্থিতিতে সংলাপ ও সঙ্গীত উপস্থাপন লক্ষ করা যায়, ঠিক তেমনি চার বন্ধুর সমবেত প্রয়াসে নানা রঙ্গচিত্র এগুলোতে ফুটে উঠে। চারইয়ারি অংশে গান থেকে নাট্যভাগই অধিক।

এরপর শুরু হয় 'পালাবন্দী গান'। গম্ভীরাগানের বিষয়বস্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত হয়ে থাকে। বাস্তবে সমাজে প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তির অসামাজিক, অনৈতিক, অমানবিক ক্রিয়াকর্মকে গম্ভীরা পালার গানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। রঙ্গ-রসিকতা ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে গম্ভীরা শিল্পীরা সংলাপ, ভাষা ও সংগীতে তাঁদের জর্জরিত করেন।

সর্বশেষ পর্যায় 'খবর'। দু'টি চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হওয়া গম্ভীরা পালায় অঞ্চলের নানাবিধ খবর উপস্থাপিত হয় এই পর্যায়ে। ত্রুটি-বিচ্যুতি হলো এই পর্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সমাজের অন্যায়, দুর্নীতি, মানুষকে অবহিত করার একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম ছিলো গম্ভীরা পালার 'খবর' পর্যায়টি। তাছাড়া এগুলোতে থাকতো পূর্ববর্তী বৎসরের পর্যালোচনাও। এ সম্পর্কে প্রদ্যোৎ ঘোষ বলেন— ''গম্ভীরা প্রকৃতপক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে বৎসরান্তে লোকসমাজ কর্তৃক বর্ষবিবরণী পর্যালোচনা।

এটি ইন্দো-মঙ্গোলয়েড জাতির একটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। আরব, মিশর প্রভৃতি দেশের অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এইভাবে পূর্ববর্তী বৎসরের বিবরণী পর্যালোচনাকে মনে করিয়ে দেয়।''[৫]

গম্ভীরার শিব

শিব পূজা কিংবা শিবমণ্ডপ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেই যে গম্ভীরার উৎপত্তি তা প্রায় সর্বজনবিদিত। কিছু পালা পর্যায়ে 'শিব' চরিত্রের যে পরিচয় আমরা লাভ করি এর সংযোজন কিন্তু গম্ভীরার প্রথম দিকে ছিলো না। প্রথম দিকে গম্ভীরা আচার নির্ভর ধর্মীয় এক পূজার্চনা ছিলো। পূর্জাচনায় যে গান গাওয়া হতো তাকে বলা হতো গম্ভীরা গীত। গীতগুলো শিবঠাকুরকে উদ্দেশ্য করেই রচিত হতো। সংসারের অভাব-অনটন, সুখ-দুঃখকে অভিযোগ স্বরূপ গীতের মাধ্যমে উপস্থাপনই ছিলো তখনকার গম্ভীরা গানের মূল উদ্দেশ্য। অনেক সময় গীতের মাধ্যমে শিবকে তিরস্কারও করা হতো। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টির জন্য কৃষকেরা গানের মধ্য দিয়ে অনেক সময় যে শিবকেও দায়ী করত, এর প্রমাণ সংগৃহীত গীতে আজও চোখে পড়ে।

কালের যাত্রাপথে বিভিন্ন বিষয়কে একত্রীকরণের ক্ষমতা রাখে লোকনাট্য। এই একত্রীকরণ কিংবা বলা যেতে পারে সাঙ্গীকরণের ক্ষমতাবলেই গম্ভীরা পালাগানে শিব চরিত্রের প্রবেশ ঘটেছে। তথ্যমতে, গম্ভীরা গায়ক মোহাম্মদ সুফী শিব চরিত্রটি গম্ভীরা পালাগানে প্রথম উপস্থাপন করেন। কথিত আছে, ব্যারিস্টার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গম্ভীরা গান শুনতে মালদহে যাবার কথা ছিলো। তখন স্থানীয় বিখ্যাত গম্ভীরা শিল্পী (লেখক ও গায়ক) সুফী আশুতোষ অর্থাৎ শিবের সম্মুখে গম্ভীরা পরিবেশনের জন্য এক অভিনেতা শিল্পীকে শিব সাজিয়ে হাজির করে গম্ভীরা পরিবেশন করেন এবং উক্ত শিব চরিত্রটি দর্শককূলে অভিনয়ের জন্য ভিন্ন এক মাত্রা অর্জন করে। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত স্যার আশুতোষের পরিবর্তে তাঁর এক প্রতিনিধি অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন। এরপর থেকেই শিব চরিত্রটি নানা গুণে সমাদৃত হতে হতে গম্ভীরা নাট্যপালার এক প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে। একটি গীত ঘটনাটির সাক্ষ্য বহন করে,

''হে দ্যাখ্, হো দ্যাখ কারে ডাকতে
কেডা এল ভাইরে—
ইনি কি স্যার আশুতোষ?
হাইকোর্টের জজ
গায়ে মাখা কেনো ছাইরে?''[৬]

পালাটিতে সংযোজিত এই শিব চরিত্র কখনো হয়ে ওঠেন সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ আবার কখনো সরকারের প্রতিনিধি। যিনি আবার বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে প্রচলিত গম্ভীরা পালা গানে 'নানা' চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। এই শিব সর্বকর্মের হোতা। কোনো

দেবত্ব আরোপ চরিত্রটিতে নেই। শিব এখানে সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের প্রতিভূ। রূপকার্থে শিব চরিত্রের গম্ভীরা পালাগানে এমন উপস্থিতি গম্ভীরা কবিদের কৃতিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রমাণ করে। ঠাট্টা রসিকতার মধ্য দিয়ে শিবকে ঘরের মানুষ করে তুলেছেন গম্ভীরার গীত রচয়িতারা। এই শিব হিমালয়ের গুহাকন্দরের আধিবাসী শিব নন। তিনি চাষার ঘরের ছেলে, আত্মীয়, সুখ দুঃখের অংশভোগী। প্রেম প্রীতি শ্রদ্ধা ভালোবাসায় লালিত।

গম্ভীরা নৃত্য

এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন ঢাক-ঢোল বাদ্য সহযোগে নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। এই অনুষ্ঠানটির অন্যতম একটি অঙ্গ হচ্ছে মুখনাচ। এই নাচ আচারনিষ্ঠ হলেও বিষয়বস্তুর ব্যাপক বৈচিত্র্যে ও সমসাময়িকতায় খুবই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ঐতিহ্য পুষ্ট নৃত্যের এই ধারাটি আজও বহমান। এই নৃত্যের সঙ্গে ঢাক ও দুটি কাঁসি বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিষয়ের বিচারে মুখনাচগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। সেগুলি হল— (ক) পুরাণ কাহিনি নির্ভর, এবং (খ) লোকসমাজ ও জীবন নির্ভর। নাচগুলো পুরুষ প্রধান। দলগত ও একক ভাবে এগুলো পরিবেশিত হয়। পুরাণ নির্ভর এই নাচের বিষয়বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেসব চরিত্র সেগুলো হল শিব, দুর্গা, কালী, রাক্ষস, চামুন্ডা ইত্যাদি। লৌকিক উপাদানে সমৃদ্ধ নাচগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য টাপা, বুড়া-বুড়ি, ধান কাটা ইত্যাদি। বর্তমানে পশু-পাখি কেন্দ্রিক কিছু নৃত্য আজও এতে দেখা যায়। প্রচলিত পুরাণ কাহিনির মতো অনেক সামাজিক কাহিনিও এতে স্থান পায়।

গম্ভীরা নৃত্য সুপ্রাচীন। প্রাপ্ত তথ্য মতে এটি পালযুগের সমসাময়িক লোকনৃত্য। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এর দিনপঞ্জিতেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। গম্ভীরা নাচে ব্যবহৃত মুখোশগুলো অধিকাংশ তৈরি হয় কাঠ দিয়ে। কাগজের মুখোশও কখনও কখনও দেখা যায়। প্রতিটি নৃত্যের শেষে অঞ্চলের দর্শক নৃত্য শিল্পীর হাতে সাধ্যমতো প্রণামী তুলে দেন। বোলবাই নাচ, কাঁটা ফোড়া, ঢেঁকিচোবানো ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গম্ভীরা নৃত্য পালিত হয়।

গম্ভীরা গান রচয়িতাদের মধ্যে মোহম্মদ সুফি রহমান (সুফী মাস্টার) ও সেখ সোলেমান উল্লেখযোগ্য। মালদহ অঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী গম্ভীরা লোকনাট্যকে কয়েকজন অন্যতম নৃত্য শিল্পীরা টিকিয়ে রেখেছেন আজও। তাঁরা হলেন সমর দাস, অমর দাস, পার্থ বসাক, আদিত্য চৌধুরী প্রমুখ।

গম্ভীরার সঙ্

সঙ যদিও আজকাল প্রায় দেখাই যায় না তবুও অতীতে গম্ভীরা পূজার চতুর্থদিন সঙ বেরোত। সঙ্ নাটকীয় ভাবপ্রকাশের প্রাচীন এক মাধ্যম ছিল। নানা অঙ্গভঙ্গি দ্বারা একটি বিষয়কে দর্শক ও শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরাই সঙের লক্ষ্য। সমাজের কোন বিশেষ মানুষের দোষ-ত্রুটি গান ও ছড়ার মাধ্যমে রঙ্গ-রসিকতার মধ্য দিয়ে সঙ কর্তৃক উপস্থাপিত

করা হয়। সঙের মিছিল দুভাবে বের হত। একটিতে ছাগলের গায়ে লালছাপ দিয়ে শহর পরিভ্রমণ করানো হত। অন্য রূপটিতে বাঁশের উপর কাপড় দিয়ে নৌকার মতো করা হত। সঙ্গে নর্তকী, গায়ক নিয়ে শহরের রাস্তা পরিভ্রমণ করা হত। আবার কখনও কখনও গরুর গাড়ির উপর শিব-পার্বতী সাজিয়ে সঙ বের করতে দেখা যেত। শিবের উদ্দেশ্যে দুঃখ-দুর্দশার অনুযোগ-অভিযোগ উত্থিত হয়। এতে স্থানীয় এবং মূলত দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্রই তুলে ধরা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গম্ভীরার সঙের গান-রিপোর্ট বা খবর জাতীয় গানেরই একটা দৃশ্যসঙ্গীত।

রামকিঙ্কর বেজের লেখা কিছু সঙের গান —

- আমাদের এই ছোট তরী উজান ভাঁটি যায়।
  মনের আনন্দে নৌকা গড়িলাম রে - ওরে ভাই ।
  মালদা টাউনের খবর, জানাই সব জবর।
  দয়া করে আপনারা শুনুন ভাই সবাই।।

- পৌরসভা এই শহরে, উন্নতি করে।
  যেথায় সেথায় রাস্তা খুঁড়ে রাস্তা চলা দায়।।

- কহি সেনেটারী অফিসার, দ্যাখেন কি টাউন ঘুরে
  বসে বসে অফিস ঘরে, ডুব দেয় নর্দমায়।

- সরকারী এলেকট্রিক সাপ্লাই, জ্ঞানের তাদের অন্ত নাই।
  জ্যোৎস্নারাতে আলো জ্বালায়, আঁধারে নিভায়।।

- এই জেলার পুলিশ সুপার, করে অন্যায় ব্যবহার।
  রেগে গিয়ে পুলিশেরে, লাথি চড় লাগায়।।

- সাপ্লাই অফিসের কথা, আছে বহু কীর্তি গড়া।
  হলে পরে এদের দয়া, নিস্তার আর নাই।।

- টাউনের ব্যবসায়ী যারা, হুজুগেতে মাতে তারা।
  বাজেটের কথা শুনে, মালপত্রের দর বাড়ায়।।[৭]

গম্ভীরার গান

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে গম্ভীরা পালানাট্যে 'বন্দনা' একটি পর্যায়। বন্দনা পর্যায়ের গান এরকম—

- আমায় সঙ্গে করে, হাতে ধরে, ঘরে নিয়ে যাও হে
  তোমার আহ্বান ধ্বনি, শুনেও না শুনি (আমায়) ঘেরিয়ে দাঁড়াও হে।।

বাসনার আশাবাণী, মরীচিকার মতটানি আগুনে পোড়াও হে,
তুমি শীতল করে দগ্ধ মর্ম-যন্ত্রণা ঘুচাও হে।।
নাহি চিনি আত্মপরে, উচ্চশিরে গর্বভরে, অমঙ্গলে ধায় হে;—
আমার মাথাটি ধরে, নত করে, তোমার চরণতলে নাও হে।।
উদ্‌ভ্রান্ত নয় দুটী, করে মিছে ছুটাছুটি, দেখিতে না পায় হে;
আমায় ঘেরিয়াছে মোহ-আঁধারে আলো জ্বেলে দাও হে।
যতই তোমারে খুঁজি, ততই হারাই পুঁজি, সময় যে যায় হে;
আমার সম্মুখে এসে, হেসে হেসে গন্তব্য দেখাও হে।।
বিশ্বময় হও তুমি, তোমারই ত ছেলে আমি, বলে দাও উপায় হে;
গোপালেরে কোলে তুলে মুখ পানে চাও হে।[৮]

❑ পড়ে শুনে শিখি শুধু তুমি বিশ্বেশ্বর ...
ভুলে গেছি তব পূজা, তাই আমরা পাচ্ছি সাজা
দুঃখের কথা কারে কহিব ...
সংস্কার রয়েছে এ পোড়া দেশে
বল পুনঃ কিসে ধর্ম ফিরে আসে
সেই উপায় আমরা শিখিব।
নিজ নিজ স্বার্থ হল ধর্ম কর্ম
একি, শিব, তোমার সনাতন ধর্ম
বুঝে দশের মর্ম করিব যে কর্ম
খাঁটি কর্ম এবার হইব।
ত্যাগী বেশে তুমি এসে এই গম্ভীরায়,
মন সাধে পূজি মোরা ভাই বোনো সবায়,
হায়, একি হল দায়, নিজে ত্যাগী হতে নাহি চায়,
এ ছলনা আমরা ছাড়িব।
বৃথা নাহি পূজিব পত্র-পুষ্প ফলে
বিবেক ফুল মাখিয়ে ভক্তি গঙ্গাজলে
শরৎ দাসে বলে দিব পদে তুলে
জনম সফল আমরা করিব।[৯]

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে সাহিত্য, গীত, লোককথা ইত্যাদিতে। গম্ভীরার গীতিকারদের সে-বিষয়ক গীত একসময় পালা-গানের মাধ্যমে প্রতিটি শ্রোতা দর্শকদের শিরায় শিরায় জায়গা করে নিয়েছিলো। গম্ভীরার অনেক গীত সে-সময় জাগরিত করেছিল পরাধীন বঙ্গবাসীর চেতনাকে। উদ্বুদ্ধ করেছিলো দেশমাতৃকার রাতুল

চরণে আত্মোৎসর্গ করতে। সেরকম কয়েকটি গান হলো,—

❑ কি করলি হে দৈন্য দশা
দেশের লোক পায়না অন্ন
হায় কি রে পস্তানর কথা
শায়েস্তা খাঁর আমলে শিবহে।
তখন গরীব দুঃখী আছিল সুখী
টাকায় আটমোনের ভাঙ বাউল হে
কুণ্ঠে গেল সে সুখের দিন
হনু দিনে দিনে দীনের অধীন শিবহে।
এখন আট সেরেও ভাও জুটেনা,
দুবেলা প্যাটে ভাত জুটে না,
তের নন্দী ভিরিঙ্গী বুড়হ্যা জাত দামড়া
কি দিয়ে পূজবো, কহেক আমরা শিবহে ...।
বছর বছর আসিস কেন
দ্যোশচ লক্ষ্মীছাড়া শয্য শূন্য ...।[১০]

❑ স্বরাজ যদি পাই হে ভোলা
খেতে দেব মানিক কলা,
নইলে আঠ্যার কলা।
বানিয়া হল দেশপতি
কি বল কে ভাই দেশের গতি
কাঁচ দিয়ে কাঞ্চানাদি নেয়
হাতে দিয়া খোলা।
কি বলবো হে ভোলা নানা
বুক ফুটেও মুক ফোটেনা
এমুখ ফুটায় ভাতের মত
উঠাও বনিকের ঝোলা।
মনোরঞ্জন বলে কর যোরে
ক্ষমা করো শ্রোতা মোরে
উচিত কথায় চটে সবাই
রক্ষা করো ভোলা।[১১]

দৈনন্দিন দৈন্যদশা, পারিবারিক অশান্তি, শাসকের শোষণ, অত্যাচার ইত্যাদির পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রসঙ্গ বিষয় হয়ে উঠেছে গম্ভীরার গানে। কৃষিকেন্দ্রিক

লোকসমাজে ফসল উৎপাদন বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু যদি বৃষ্টিপাতের অভাব দেখা দেয় তবে কৃষকের সমস্যার সীমা থাকে না।

অনাবৃষ্টি কৃষক জীবনের চরম দুর্ভাগ্য। গম্ভীরা গানেও দেখা যায় অনাবৃষ্টির প্রসঙ্গ, যেখানে বাংলার কৃষকরা পালা-গানের মাধ্যমে এই অনাবৃষ্টির জন্য শিবকে দায়ী করছেন। এরকম দু-একটি গান হলো, —

❑ শিব, তোমার লীলাখেলা কর অবসান,
বুঝি বাঁচে না আর জান।
অনাবৃষ্টি কইর‍্যা সৃষ্টি
মাটি করলা নষ্ট হে,
দৃষ্টি থাকতে কষ্টি কইর‍্যা
দেখছ না কি কষ্ট হে,
মিষ্ট কথায় তুষ্ট কইর‍্যা
শিষ্ট লোকের ইষ্ট মাইর‍্যা,
করিলা মোদের গুষ্টি ছাড়া।
শুন বলি পষ্ট কর‍্যা,
তারপরে ম্যালেরিয়ায়
হইলাম হালা কান,
বুঝি বাঁচে না আর জান।
অন্নদা মা ভিক্ষা তোমার
করবে না কি দান হে,
সময় কালে না হয়্যা জল
অসময়ে ফলল কুফল।
(ওসব) মুশুরী কলাই গেল ডুব্যা
ক্ষেতের ফসল ম'ল,
আম গ্যাল ছালা গ্যাল
ক্যামনে ধরি গান
বুঝি বাঁচে না আর জান।[১১]

❑ এবার কি খাবা, হে বাবা, পুরাল চাবাও বইস্যা।
কোন মুলুকের বন্যা এলো মোর বাবা হে —
মোর বাব্বী হে।
কোন্ দোখ্ না বাতাস আইস্যা হে পুরাল চাবাও বইস্যা।
আমের গাছের ডান্টা খাড়ু ভাদই ধানের আশা ছাড়

ভাতিয়ার বিল হাতিয়ার পিলে মোর বাবা হে
মোর বাব্বী হে।
কোন্ দোখ্ না বাতাস আইস্যা হে পুরাল চাবাও বইস্যা।[১২]

সূত্রনির্দেশ :

১। হরিদাস পালিত, আদ্যের গম্ভীরা, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ ১৩১৯, পৃ. ৪৪।
২। কল্যাণকুমার দাস, মধ্যবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, মুর্শিদাবাদ, পব ২০১১, পৃ. ২০৮।
৩। মিহির ভট্টাচার্য (সম্পা), লোকশ্রুতি 'গম্ভীরা গান-একটি রূপরেখা' পুষ্পজিৎ রায়, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পব ১৯৯৯, পৃ. ২৫৭।
৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭।
৫। সনৎকুমার মিত্র (সম্পা), বাংলা গ্রামীণ নাটক (বাংলা লোনাটক গম্ভীরা প্রদ্যোত ঘোষ), কলকাতা, পঃবঃ, ২০০০, পৃ. ৭০।
৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫।
৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।
৮। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য (তৃতীয় খন্ড) : গীত ও নৃত্য কলকাতা, পৃ. ২৪৫-২৪৬।
৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫।
১০। কল্যাণকুমার দাস (সম্পা), তদেব, পৃ. ২১০।
১১। প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০।
১২। আশুতোষ ভট্টাচার্য, তদেব, পৃ. ২৪৭।
১৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮।

পুরুলিয়ার লোকনাট্য : ছৌ

বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ও তৎসংশ্লিষ্ট ওড়িশা ও বিহার প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরম্পরাগত ধর্মীয় আচার নিষ্ঠ লোকনাট্য 'ছৌ'। এটি একপ্রকার আদিবাসী যুদ্ধনৃত্য। অঞ্চলভেদে উচ্চারণের ভিন্নতার কারণে এটি বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন— 'ছো', 'ছ', 'ছট', 'ছাউ' ইত্যাদি। তবে এর সর্বজনবিদিত নাম 'ছৌ'। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা এই নাচের আদি উৎসস্থল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উৎপত্তি ও বিকাশের স্থল অনুযায়ী ছৌ নাচের তিনটি অঞ্চলগত বিভাগ রয়েছে। সেগুলো হলো— পুরুলিয়ার ছৌ, সরাইকেল্লার ছৌ ও ময়ূরভঞ্জ ছৌ।[১] সরাইকেল্লার ছৌ এর উৎপত্তি অধুনা ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের সরাইকেল্লা খরসোয়া জেলায় এবং ময়ূরভঞ্জ ছৌ-এর উৎপত্তি ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলা।[২]

'ছা' শব্দের উদ্ভব প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। 'ছদ্ম' (সংস্কৃত শব্দ), 'ছায়া', 'ছাউনী', 'উৎসব', 'সঙ', ছাম্ (তিব্বতীয় শব্দ), 'ছক্' (মুণ্ডারি শব্দ)— প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দ থেকে বিভিন্নজন ছৌ শব্দের উৎপত্তির কথা বলেছেন। বাংলার পুরুলিয়া ও মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানের প্রচলিত ভাষায় 'ছৌ' করা অর্থ বোঝায় 'ঢঙ' করা। আবার অনেকের মতে 'ছৌ' নাচ ছয় নাচের সমাহার। প্রচলিত ওড়িয়া ভাষায় 'ছৌ' শব্দের অর্থ দাঁড়ায়— 'গোপনে শিকারের অনুসরণ করা' —শেষোক্ত এই অর্থের মধ্য দিয়ে ছৌনৃত্যের মূল চরিত্রটি অনেকখানি প্রতিফলিত হয়।[৩]

ছৌ নাচের নামকরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকমের মত রয়েছে। ড. পশুপতি প্রসাদ মাহাতো ও ড. সুধীর কুমার করণের মতে এই নাচের নাম ছো,[৪] আবার বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত ও ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাতোর মতে এই নাচের নাম 'ছ'। লোকসংস্কৃতিবিদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য সর্বপ্রথম 'ছ' বা 'ছো' নাচের পরিবর্তে এটিকে 'ছৌ' নামে অভিহিত করেন এবং বিদেশে এই নাচের প্রদর্শনের ব্যবস্থা করার পর এই নাচ 'ছৌ নাচ' নামে জনপ্রিয় হয়ে পড়ে।[৫] রাজেশ্বর মিত্রের মতে, তিব্বতী সংস্কৃতির 'ছাম' নৃত্য থেকে ছৌ নাচের উদ্ভব ঘটেছে।[৬] ড. সুকুমার সেনের মতে শৌভিক বা মুখোশ থেকে নাচটির নামকরণ 'ছৌ' হয়েছে। কুশালী ও ওড়িয়া ভাষায় ছুয়া বা ছেলে থেকে এই নাচের নামকরণ হয়েছে

বলে অনেকে মনে করেন। কারণ 'ছৌ' প্রধানত ছেলেদের নাচ। ড. সুধীর করণের মতে 'ছু-অ' শব্দের অর্থ ছলনা ও সঙ্। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন, 'ছৌ' শব্দটি এসেছে 'ছায়া' থেকে। সীতাকান্ত মহাপাত্র মনে করেন, এটি 'ছাউনি' শব্দটি থেকে উদ্ভূত।[৭]

'ছৌ' নৃত্যের উৎসমূলে শিব-গাজনের প্রভাব আছে। তাছাড়া নাচের তাল, ভঙ্গিমা, রস নিষ্পত্তি ইত্যাদি বিষয় লক্ষ করে এটিকে কেউ কেউ যুদ্ধনৃত্য বলেও অভিহিত করেন। 'ছৌ' লোকনাট্য যে যে অঞ্চলে বেশি চোখে পড়ে সে-সব অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক সাঁওতাল, মুণ্ডা, কুর্মি ইত্যাদি আদিবাসী। এইসব আদিবাসী উপজাতিদের মধ্যে খুব প্রাচীনকাল থেকে শিকার করার কৌশল রপ্ত করার জন্য নৃত্যের মহড়া চলতো।[৮] 'ছৌ' নৃত্যে ভেসে ওঠা এই ভঙ্গিগুলো আদিম আদিবাসী নৃত্য থেকে গৃহীত। তাছাড়া ভারতীয় গুহা চিত্রে অঙ্কিত বিভিন্ন নৃত্য কলার ভঙ্গি 'ছৌ' নৃত্যে দৃষ্টিগোচর হয়। লোকসংস্কৃতিবিদেরা মনে করেন যে 'ছৌ' নৃত্যে নৃত্যকলার যে ভঙ্গি তা আদিবাসীদের শিকারের অঙ্গ হিসাবে তাদের জীবনধারণে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলো এবং পরবর্তীতে সামন্ত হিন্দু রাজাদের প্রভাবে এটি লোকনাট্যের মর্যাদা পায়।[৯] পরবর্তীকালে রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণকথা ছাড়াও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা বিষয় এই লোকনাট্যে স্থান পেতে শুরু করে এবং কালক্রমে এই লোকনাট্যটি উপজাতিদের নৃত্য বৈশিষ্ট্য, শাস্ত্রীয় রীতির অনুসরণ, গ্রাম্য নৃত্যের সরলতা, যুদ্ধ নৃত্যের উদ্দীপনা ও মুখোশ শিল্পের অনন্যতায় গুণগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এক অভিনব পরিচয় লাভ করে।

'ছৌ' বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধনাচ; ঢাল তলোয়ার ও লাঠি নিয়ে এ নাচ অনুষ্ঠিত হয়। রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বনে ছৌ-নাচের পালা রচিত হয়। পালায় দেব, দানব, পশু প্রভৃতির চরিত্রানুযায়ী মুখোশ ও পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হয়। এ নাচে অনেক শক্তির প্রয়োজন হয় বলে শিল্পীদের সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হয়। এতে মুখোশ ও অলঙ্কার পরিধান করে পুরুষরাই নারী চরিত্রে নৃত্য করেন। 'ছৌ'-নাচ শিবের গাজন উপলক্ষে বৈশাখ মাসে বেশ ঘটা করে অনুষ্ঠিত হয়। তবে বর্তমানে উপলক্ষ ছাড়াও যেকোনো সময় যেকোনো স্থানে এ নাচ প্রদর্শিত হয়। বাগদি ও ভুঁইয়া সম্প্রদায়ের অন্ত্যজ শ্রেণির লোকদের মধ্যে এ নৃত্যের প্রচলন বেশি। বীররসের এ নৃত্যে মস্তক, গ্রীবা, হস্ত, বক্ষ, পদ প্রভৃতি অঙ্গের কাজ বেশি। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে বীরভাব, শান্তভাব বা ক্রোধভাব ফুটিয়ে তোলা হয়। তবে এ নৃত্যে পায়ের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পী কখনো একক, কখনো সমবেতভাবে লম্ফঝম্ফ দেয়, ঘুরপাক খায়, হাঁটু গেড়ে বসে, আবার হঠাৎ উঠে প্রতিপক্ষের দিকে তেড়ে যান।

ছৌ-নাচের আসরটি হয় বৃত্তাকার অঙ্গনে। বৃত্তের মধ্যে বাজনদাররা থাকে এবং চরিত্রের গমনাগমনের জন্য একটা সরু পথ থাকে। দর্শকরা থাকে বৃত্তের বাইরে। ধামসা,

ঢোল ও সানাই এ নৃত্যের প্রধান বাদ্যযন্ত্র। 'ছৌ-নাচ' শুরু হয় গণেশ বন্দনা দিয়ে; পরে চরিত্রের আগমন উপলক্ষে দুই চরণের সংক্ষিপ্ত গীত গাওয়া হয়। 'ছৌ'-নাচে গান অপেক্ষা নাচ ও বাদ্যের অংশই বেশি। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে 'ছৌ'-নাচ গ্রাম থেকে শহরে এবং পরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রচার লাভ করে।

পুরুলিয়া, সেরাইকেল্লা ও ময়ূরভঞ্জে 'ছৌ' নৃত্যের যে ত্রিধারা পরিলক্ষিত হয় সেগুলোর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই পার্থক্য বিদ্যমান। পুরুলিয়া ও সেরাইকেল্লার নৃত্যশিল্পীরা মুখোশ পরিধান করেন কিন্তু ময়ূরভঞ্জের 'ছৌ' নৃত্যে মুখোশের ব্যবহার নেই। সেরাইকেল্লার মুখোশগুলির মধ্যে সেরাইকেল্লার রাজাদের অভিজাত রুচি ও কল্পনাপ্রবণ মানসিকতার ছাপ স্পষ্ট। পুরুলিয়ার 'ছৌ' নৃত্যের মুখোশগুলো বীরত্বব্যঞ্জক ও দৃপ্ত। পুরাণকেন্দ্রিক দেব-দানব ও পশু চরিত্রের কথা মাথায় রেখে মুখোশগুলো তৈরি করা হয়। অন্যদিকে ময়ূরভঞ্জের 'ছৌ' নৃত্য ঢাল ও তরোয়াল সহযোগে আক্রমণ ও প্রতিরোধের ভঙ্গিমার মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। ময়ূরভঞ্জের 'ছৌ' নৃত্যে প্রধান বাদ্যযন্ত্র হলো ধামসা, ঢোল, চর-চরি, টিকারা, বাঁশি প্রভৃতি। ময়ূরভঞ্জের 'ছৌ' নৃত্যে 'বীররস' 'শৃঙ্গাররস' এবং দুই রসের মিশ্র প্রভাব দেখা যায়। এ অঞ্চলের প্রচলিত কয়েকটি জনপ্রিয় ছৌ-নৃত্যপালার নাম হলো — 'বিশ্বামিত্র', 'কৈলাসলীলা', 'দশাবতার', 'মহিষমর্দিনী','মায়াশবরী','বংশীচুরি' ইত্যাদি।

সোরাইকেল্লা ছৌনৃত্যপালাগুলিতে একদিকে যেমন থাকে নীতিময়তা ঠিক তেমনি অধিকাংশ নৃত্য পালার মধ্যে এক রূপকাশ্রয়ী ইঙ্গিতধর্মী বিষয় বা ঘটনা পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে পালার সঙ্গে বাজানো হয় 'ধামসা', 'ঢোল', 'সানাই', 'রণশিঙা', 'তুরী', 'সিংহদা', 'মাহুরি', 'ভেরি', 'আঁড়বাঁশি' ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র।

পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্যে পুরাণকেন্দ্রিক ঘটনাই প্রাধান্য লাভ করে। এই নৃত্যধারার মধ্যে বীররসই প্রধান। প্রায় প্রতিটি নৃত্যপালার মধ্যে যুদ্ধের অনুষঙ্গ উপস্থাপিত হয়। অশুভশক্তির পরাজয় ও শুভশক্তির জয়ের মধ্য দিয়ে এক ধরনের আদিম বিশ্বাস পরিতৃপ্ত হয়ে থাকে। নৃত্যপালাগুলির মধ্যে 'মহিষাসুরমর্দিনী', 'রাবণবধ', 'গয়াসুর বধ', 'তরণীসেন বধ', 'তারকাসুর বধ', 'মদনভস্ম', 'কিরাতার্জুনীয়' প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়। বাদ্যের মধ্যে ধামসা, ঢোল, সানাই-ই প্রধান। পুরুলিয়ায় প্রত্যেকটি নৃত্যপালা শুরু করা হয় 'গণেশ বন্দনা' দিয়ে। ছৌ নৃত্যের ত্রিধারার মধ্যে পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য সবচেয়ে বেশি সংরক্ষণশীল। এই নৃত্য কোনো রাজপরিবারের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ না করেও বেঁচে আছে লোকজীবনের বিশ্বাস, ধর্ম ও সংস্কৃতি চেতনায়। ছৌ নৃত্যের বন্য আদিরূপটি পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্যের মধ্যে এখনও বেঁচে আছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উৎসবের মধ্যে দিয়েই প্রতি বৎসর ছৌ নাচের উদ্বোধন হয় পুরুলিয়া জেলায় এবং

বিভিন্ন গ্রামের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নৃত্য চলতে থাকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসব্যাপী। সেরাইকেল্লা ও ময়ূরভঞ্জে প্রতিবৎসর 'চৈত্রপরব' উপলক্ষে তিনদিন ধরে ছৌনৃত্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ময়ূরভঞ্জ ও সেরাইকেল্লায় প্রতিবৎসর 'চৈত্রপরব' উপলক্ষে চৈত্রসংক্রান্তির অগ্রবর্তী চারদিন ধরে শিব ও শক্তির আরাধনায় বিভিন্ন ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াচার প্রতিপালিত হয়। 'যাত্রাঘটের' আগমনে ছৌনৃত্যোৎসবের সূচনা করা হয়।[৯] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ময়ূরভঞ্জের ছৌনৃত্যের ভাবকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলো হলো — (১) হাতিয়ার ধরা (২) কালিভঙ্গ (৩) কালিভঙ্গ হাতিয়ার ধরা।

ছৌনৃত্য পরিবেশনের পূর্বে ছৌশিল্পীরা সারা চৈত্র মাস ধরে অনুশীলন করে থাকেন। চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু করে সারা বৈশাখ মাস ও জ্যৈষ্ঠ মাসের তেরো তারিখে অনুষ্ঠিত রহিন উৎসব পর্যন্ত ছৌ নাচ নাচা হয়ে থাকে। পুরুলিয়া জেলায় শিবের গাজন উপলক্ষে ছৌ নাচের আসর বসে।[১০]

বিষয়গতভাবে ছৌনাট্যরীতি মহাকাব্যিক। এতে সর্বশেষে সৎ-এর জয় ও অসৎ-এর পরাজয় দেখানো হয়। ছৌলোকনৃত্যের মুখোশ পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। নৃত্যশিল্পীরা যে মুখোশ পরেন তা মাটি, খবরের কাগজ, পুরোনো কাপড় ইত্যাদি উপকরণের সাহায্যে তৈরি করা হয়। মুখোশের মুকুটকেও বিভিন্ন রঙ দিয়ে উজ্জ্বল করা হয়। এই মুখোশ নানা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তৈরি করতে হয়। প্রথমে ৮ থেকে ১০টি নরম কাগজকে আঠাতে ডুবিয়ে পর পর স্তরে আটকে একটি আকার দেওয়া হয়। তার ওপর একখণ্ড কাদা নিয়ে তার সাথে ভস্মচূর্ণ মিশিয়ে আকারটিকে পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলা হয়। মুখের সূক্ষ্মকাজগুলি করা হয় কাদামাটির মাধ্যমে। তার ওপর কাদাসহ কাপড়ের একটি আস্তরণ দেওয়া হয় এবং পরে তা সূর্যালোকে শুকিয়ে নেওয়া হয়। শুকিয়ে গেলে সেটিকে পালিশ করে কাদার খণ্ড থেকে কাগজ ও কাপড়ের আস্তরণটি সরিয়ে নিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য সূর্যালোকে শুকানো হয়। মুখোশের ছাঁচ তৈরি হয়ে এলে নাক ও কানের অংশে গর্ত করে নানা রঙে রাঙিয়ে চারিধারে বিভিন্ন ধরণের অলঙ্করণ করা হয়।[১১]

পুরুলিয়ার ছৌমুখোশ তৈরির ইতিহাস অতি প্রাচীন। প্রাপ্ত তথ্য মতে, পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডির রাজা মদনমোহন সিংহ দেবের সময় থেকে ছৌ মুখোশ বানানোর ঐতিহ্য চলে আসছে। তিনি ছিলেন এই লোকশিল্পের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। ছৌ মুখোশ ঐতিহ্যগতভাবে মানভূমের প্রাচীন নৃত্যশৈলীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যা সময়ের সাথে অবলুপ্ত হলেও মুখোশ তৈরি শিল্পটি আজও হারিয়ে যায়নি। ছৌমুখোশগুলি প্রধানত পৌরাণিক চরিত্র কেন্দ্রিক — যেমন, মহিষাসুরমর্দিনী, রাম-সীতা, রাম-রাবণের যুদ্ধ ইত্যাদি। অনেকক্ষেত্রে সাঁওতাল দম্পতির মুখোশ রূপক হিসাবেও ব্যবহার হয়। মূল মুখে

াশের চারধারে দুই ফুট পর্যন্ত গয়না ও কাপড় দিয়ে বিভিন্নভাবে অলংকরণ করা হয়। দুর্গা লক্ষ্মী, কার্তিক এর মুখোশগুলিকে গাঢ় হলুদ বা কমলা রঙ করা হয়। শিব, সরস্বতী ও গণেশ এর মুখোশগুলি সাদা রঙের হয়ে থাকে। কালো রঙের হয় কালীর মুখোশগুলো। বৈষ্ণবীয় রীতি মেনে রাম ও কৃষ্ণের মুখোশগুলোর কপালে তিলক কাটা হয়ে থাকে। ভয়ঙ্কর রঙ সহ বিচিত্র গোঁফের দ্বারা তৈরি করা হয় অসুরের মুখোশ।

ছৌনৃত্যনাট্যে শিল্পীরা যদিও কোন সংলাপ ব্যবহার করেন না, তবে শিল্পীদের নানা অঙ্গ-ভঙ্গিমূলক অভিনয় এটিকে নাট্যধর্মী করে তোলে। লোকধর্মী ও নাট্যধর্মী উভয় অভিনয়রীতি ছৌনৃত্যে উপস্থিত। নৃত্যটির লয় বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত।

সূত্রনির্দেশ :

১। Claus Peter J, South Asian Folklore and Encyclopedia ISBN 0415939194-2003, page-109

২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

৩। দুলাল চৌধুরী, বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অফ ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১৯৬।

৪। সুধীর কুমার করণ, সীমান্ত বাংলার লোকযান, প্রথম আকাশদীপ সংস্করণ, ২০১৩, পৃ. ২২১।

৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২।

৬। রাজেশ্বর মিত্র, ছত্রাক, নবম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃ. ২১২-২১৩।

৭। 'The Chhau', Seraikela Kharsawan district official website আর্কাইভ থেকে ২৭/০৫/২০২০ তারিখে সংগৃহীত।

৮। দুলাল চৌধুরী, বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১৯৭।

৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮।

১০। দিলীপ কুমার গোস্বামী, সীমান্ত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি, পারিজাত প্রকাশনী, পুরুলিয়া, প.ব. ২০১৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

১১। The Marks of Bengal. squarespace.com থেকে সংগৃহীত।

বাংলার 'গাজীপালা'

।। এক।।

'গাজী' আরবি শব্দ। এর অর্থ ধর্মযোদ্ধা বা প্রসিদ্ধ বীর। বঙ্গদেশের সংস্কৃতির নানা উপাদানে গাজীর থান, গাজীর গান, গাজীর নৃত্য, গাজীর পট, গাজীর পালা, গাজীর কিংবদন্তি, মন্ত্র ইত্যাদি বর্তমান। প্রশ্ন জাগে এই 'গাজী' কোন গাজী? আরবি শব্দার্থে ব্যক্ত হওয়া ধর্মযোদ্ধা বা বীর, না-অন্য কেউ?

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বঙ্গদেশের 'গাজী' ব্যক্তিবিশেষ। অঞ্চলভেদে এঁর নাম ও রূপগত ভিন্নতা বর্তমান। কেউ কেউ গাজীকে মুসলমান সমাজের ধর্মপ্রচারক হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। কারো কারো মতে তিনি 'পীর'; অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। 'পীর' পার্শি শব্দ, যার অর্থ 'বুদ্ধব্যক্তি' বা 'আধ্যাত্মিক গুরু'। অনেকে আবার গাজীকে বাঘের দেবতা বলেও মত পোষণ করেছেন।

আধুনিক গবেষকদের অভিমত, গাজী ঐতিহাসিক ব্যক্তি। গৌড়ের অধিপতি রুকনুদ্দি কারকাউমের শাসনাধীন ত্রিবেণী অঞ্চলের জাফর খাঁন গাজীর পুত্র তিনি। লোককাহিনি মতে গাজী সিকন্দর নামক এক রাজার পুত্র। তাঁর মাতা অজুফা কলি। অঞ্চলভেদে তাঁর ভিন্ন নাম— বড় খাঁ গাজী, গাজীপীর, বড় খাঁ, বড় খান জিন্দাপীর, বরখান, বরকান গাজীসাহেব, বরকন, গাজীবাবা, ইসমানাল গাজী, মবরা গাজী, মোবারক শাহ গাজী প্রভৃতি। লোকসমাজে তিনি এক অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন, আর্তজনের মনোবাঞ্ছা পূরণকারী হিসেবে পরিচিত। এ বিষয়ে সুকুমার সেন আমাদের জানিয়েছেন যে চতুর্থ দশকের পীর সুফি খানই ষোড়শ শতকে 'গাজী' (বড়খাঁ গাজী) নামে পরিগণিত হন। 'গাজী'-কে রূপক অর্থে অনেকে 'জ্ঞানী ব্যক্তি' রূপেও মান্যতা দিয়েছেন।

গাজী মূলত দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর এবং বাংলাদেশের খুলনা, যশোর প্রভৃতি অঞ্চলে পূজিত লৌকিক দেবতা। তিনি সুন্দরবন, খুলনা অঞ্চলের মানুষের কাছে এক পরম আরাধ্য দেবতুল্য পীর। তিনি মূলত বাঘের পীর বলে পরিগণিত হলেও সুন্দরবনের সব জীবজন্তুই তাঁর অধীন। দক্ষিণরায়, বনবিবির মতো গাজী ও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সুন্দরবন অঞ্চলে পূজিত ও শ্রদ্ধাবনত মান্যতা পেয়ে থাকেন। জীবন ধারণের

তাগিদে সুন্দরবন অঞ্চলের জঙ্গলে প্রবেশের সময় লোকসমাজ গাজীর নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। হিংস্র প্রাণীর ভয়, গবাদি-পশুর অসুখ, সন্তান লাভ ও জীবনের নানা সমস্যায় সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের মূল ভরসা গাজীবাবা-ই। মধ্যযুগের প্রাক্‌লগ্নে বাংলার বর্ণ হিন্দু সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে শোষণ ও অত্যাচার রোধে গাজীরা ধর্মকে কাজে লাগাতো। এর জন্য তাঁদেরকে 'ধর্মীয় আধিপত্য বিস্তারকারী' রূপেও অনেকে তকমা দিয়ে থাকেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি নিম্নবর্গের মানুষের হয়ে সামন্ত প্রভুদের অন্যায়-অত্যাচার শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই, অলৌকিক শক্তি, বীরত্ব প্রদর্শন ও মানবতার সঙ্গী হওয়ার জন্য হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আপামর প্রান্তিক মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা পেতে শুরু করেন এবং মানুষের ঐহিক কামনা-বাসনা পূরণের সহায় হিসেবে মান্যতা পেয়ে যান। তাছাড়া, অলৌকিক ক্ষমতা বলে বাঘকে দমন ও বশ করার নৈপুণ্য দেখে কালক্রমে বঙ্গদেশে গাজীর ধর্মযোদ্ধার পরিচয় লুপ্ত হয়ে যায় এবং সমন্বয় ভাবনার এক লৌকিক দেবতা হয়ে ওঠেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অবিভক্ত বঙ্গদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই গাজীকেন্দ্রিক, গান, পালা, পট, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি ইত্যাদির প্রমাণ পাওয়া গেলেও গাজী পূজার উদ্ভব ও বিকাশ মূলত সুন্দরবনের লোকসমাজকে কেন্দ্র করে।

।। দুই।।

গাজী প্রধানত দু'টি রূপে পূজিত হয়ে থাকেন। পটে অংকিত গাজী যুদ্ধবস্ত্র পরিহিত থাকেন। বাঘ তাঁর বাহন। আবার খুলনা অঞ্চলে গাজীর মাটির মূর্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতীকী মূর্তিতেও তাঁর পূজার সাক্ষ্য মিলে। গাজীর পূজাতে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। ইসলাম ধর্মাবলম্বী ফকিররাই তাঁর পূজার ভোগ নিবেদনকারী। দুধ-ক্ষীরের শিরনি, বাতাসা, আতপ চালের শিরনি, পিটালি, কলা, গুড়, নকুল ইত্যাদি উনিশটি উপাচার দিয়ে তাঁর নৈবেদ্য সাজানো হয়। সঙ্গে জ্বালানো হয় ধূপ ও মোমবাতি।

গাজী পীরের মূর্তি সুশ্রী ও বীরত্বব্যঞ্জক। মূর্তির রঙ ফর্সা। মাতায় টুপি, লম্বা দাড়ি এবং গোফ কান পর্যন্ত প্রসারিত। এক হাতে অস্ত্র, অন্যহাতে লাগাম অশ্বদন্ড, পায়ে থাকে বুটের জুতো। সুন্দরবনে প্রবেশকারী চাষী, জেলে, মউলে, বাউলে, মলিঙ্গীরা গাজীর সব থেকে একনিষ্ঠ ভক্ত বলে পরিচিত। বিস্তীর্ণ সুন্দরবনের কোন কোন অঞ্চলে তাঁর মূর্তির সম্মুখে/থানে ভক্তরা পাঠাবলি বা জীবন্ত মুরগি উৎসর্গ করে থাকেন। গাজীর থানে অনেকে আবার মানতও করেন এবং অভিলাষ পূর্ণ হলে গাজীকে ভোগ নিবেদন করেন। গাজীর থানের খাদেম কর্তৃক প্রদত্ত জলপড়া, তুক-তাক্, তাবিজ-কবজ ও মাদুলি ভক্তরা শ্রদ্ধায় ব্যবহার করার রীতি সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

।। তিন।।

বঙ্গদেশে গাজী এক নন, অনেক। তবে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে বলা যায়, গাজীকেন্দ্রিক বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান সৃষ্টিতে একজন অলৌকিক শক্তির অধিকারী ব্যক্তির প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিলো। ইতিহাসবিদ ও লোকবিদদের প্রদত্ত নানা তথ্য এর সাক্ষ্য বহন করছে। 'বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ' গ্রন্থে বলা হয়েছে— "ত্রিবেণীর জাফর-খাঁন-গাজীর পুত্র 'বড় খান গাজী' ও তাদের বংশধররা পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। কথিত আছে বড় খান গাজী ধর্ম প্রচার করতে এসে জনৈক হিন্দু নরপতিকে পরাস্ত করে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন এবং স্বীয় ক্ষমতাবলে সুন্দরবনে প্রভাব বিস্তার করেন। তাছাড়াও তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা বলে লোকদের বিশ্বাস উৎপাদন ও ভক্তি শ্রদ্ধা আদায় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শোনা যায়, বড় খাঁ নিয়ম করেছিলেন যে তাঁকে উপযুক্ত নজরানা না দিয়ে কেউ তাঁর এলাকার মধু, মোম, কাঠ সংগ্রহ করতে পারতেন না। দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাঘ্রভীতি থাকায় ইনিও ব্যাঘ্রদেবতা রূপে স্থানীয় মানুষদের শ্রদ্ধা পূজা পেতে থাকেন।"[১] পরম্পরাগত কাহিনি মতে গাজী হলেন সিকন্দর নামক রাজার পুত্র। চম্পাবতী নামে এক ব্রাহ্মণ কন্যা তাঁর প্রেমিকা (মতান্তরে স্ত্রী) ছিলেন। গাজীর দৈবশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব তাঁকে সুন্দরবন অঞ্চলে দেবতার আসন পাইয়েছে। উদার দৃষ্টিভঙ্গি, ঈশ্বরভক্তি, সুষ্ঠ-সুন্দর জীবন পরিচালনের উপদেশকারী ও প্রান্তিকায়িত জনমানসের প্রতি তাঁর আন্তরিক বন্ধুত্বসুলভ মানসিকতার বলেই সুন্দরবন এলাকায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তিনি শ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয় হর্তা-কর্তা ও বিধাতারূপে সমাদৃত। সুন্দরবন এলাকায় লোকসমাজে 'কালু রায়' নামক এক লৌকিক দেবতার গুরুত্ব অপরিসীম। কিংবদন্তি বলে, কালু 'গাজী'-র ভাই। কিন্তু এ সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদরা একমত নন। অনেকে তাঁকে সহোদর বলতে নারাজ। তবে সুন্দরবন অঞ্চলে কালু কুমির-এর দেবতারূপে যে পূজিত হচ্ছেন এর তথ্য ও সত্যতা মিলে। তাছাড়া রাজ কন্যা চম্পাবতীর সঙ্গে গাজীর পরিণয় এবং সুন্দরবনে আধিপত্য বিস্তারের জন্য দক্ষিণা রায়ের সঙ্গে গাজীর যুদ্ধে কালু তাঁকে সাহায্য করেছিলো।

।। চার।।

শাস্ত্রীয় দেবদেবীর মতো সুন্দরবন অঞ্চলে পূজিত লৌকিক-পীর গাজীর হাতে থাকে এক 'আয়ূধ'। যাকে 'আসা'/'আষা' বলা হয়। আরব মূলের শব্দ 'আস' এর অর্থ হলো 'দণ্ড' বা 'লাঠি'। লাঠিটির উপরের অংশে গোলাকৃতি একটি পিতলের পাত থাকে এবং নিম্নাংশে থাকে কাঠ বা বাঁশের তৈরি দণ্ড। উপরের গোলাকৃতি দণ্ডের মধ্য অংশের ডান ও বামদিক মানুষের চোখের আকারের মতো করে কাটা থাকে। আসটি দেখতে অনেকটা মুখাবয়বের

অনুরূপ। গাজীর থানে গাজীকে শিরনি কাঁসার থালায় নিবেদন করতে হয়। কোনো কোনো অঞ্চলের গাজী পীরের হাতে অস্ত্র হিসেবে তলোয়ারও চোখে পড়ে।

গাজীর থানে অথবা গাজীর কাছে মানত করা ভোগ নিবেদন অনুষ্ঠানে (গাজীর সেবায়) নানা ক্রিয়াচার পালন করার রীতি আছে। গাজীর আসরে গায়েন এক হাতে 'গাজীর আস' আর অন্যহাতে 'চামর' নিয়ে গান পরিবেশন করেন। গায়েনের পোশাক হয় অনেকটা 'ওঝা নৃত্যের' গায়েন-এর পোশাকের মতো। গায়নকে গান শুরু করার পূর্বে হাতের আসাটিকে মাটিতে পুঁতে রেখে তার নিচে কাঠের চৌকির উপর কাঁসার থালায় শিরনি দিতে হয়। পরে দলের মূল গায়েন শিরনির থালাটিকে মাথায় নিয়ে সাতবার পুতা 'আস'-টিকে প্রদক্ষিণ করেন। এরপর যথাস্থানে থালাটি রেখে আস-টি দু'হাতে তুলে তাঁর (আস) প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করেন।

গাজীর গায়েনেরা গানের সময় যে 'চামর' ব্যবহার করেন সেটি পাহাড়ি গরুর লেজের চুল দিয়ে কাঠ/পিতল/রূপার বাট জোড়া লাগিয়ে তৈরি করা হয়। গায়েন উপস্থিত দর্শকদের মাথায় 'চামর' স্পর্শ করিয়ে আশীর্বাদ দেন। কখনো কখনো মনোকামনা পূরণের জন্য মানতকারীরা চামর ভেজানো জল সপ্তাহের বেজোড় দিনে পান করেন শুভফলের আশায়।

ভারতীয় শাস্ত্রে আছে— ''পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'' অর্থাৎ পুত্রসন্তান লাভের জন্য ভার্যা গ্রহণ করা হয়। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্তর্গত বঙ্গদেশের লোকসমাজেও এই ভাবনা ক্রিয়াশীল। লোক সমাজের বিশ্বাস, পুত্র হলে সে পিতা-মাতাকে নরক থেকে রক্ষা করবে, ইহলোকে বংশ পরম্পরা বজায় রাখবে এবং পারিবারিক ধর্ম পালন করবে। তাই পুত্রসন্তান জন্মের জন্য বা পুত্র লাভের জন্য বিভিন্ন লৌকিক ক্রিয়াচার পালনের রীতির প্রচলন আছে। গাজীকে কেন্দ্র করে 'বাঁশ নাচানো' ও 'গাজীর বাঁশ বিয়ে' নামক আচারও এরকম একটি। লোকবিশ্বাসে 'বাঁশ' বংশবৃদ্ধির প্রতীক। বাঁশ-শব্দটির সাথে বংশবৃদ্ধির সাদৃশ্য থেকে কেউ কেউ মনে করেন যে 'গাজীর বাঁশ নাচানো' আচার পালিত হয় বংশ রক্ষার জন্য। নিঃসন্তান দম্পতি পুত্র সন্তান লাভের বাসনায় এই আচারটি পালন করে থাকেন। লোকসংস্কৃতিবিদ ওয়াকিল আহমেদের মতে, গাজীপীরকে কেন্দ্র করে বাঁশবিয়া বগুড়া অঞ্চলের মুসলমান কৃষক সমাজে প্রচলিত একটি লোকপ্রথা। এই প্রথা অনুযায়ী একটি বাঁশকে গাজী পীরের প্রতীক করে মানব কন্যার সাথে এর বিবাহ দেওয়া হয়। তবে এটি শুধু বগুড়া অঞ্চলে নয়, সুন্দরবন নির্ভর অনেক অঞ্চলের লোকসংস্কার ও আচারে এমন রীতির প্রচলন পাওয়া যায়। এমনকি বৃক্ষের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেবার রীতি ভারতের অনেক কৌমে আজও এক গুরুত্বপূর্ণ লৌকিক আচার। ধারণা এই যে, বাঁশের ঝাড়ের নতুন বাঁশবৃদ্ধির ন্যায় পরিবারে পুত্র সন্তানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে।

গাজীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই আচারটি পালনের জন্য বিশেষ এক থান বা

দরগা তৈরি করা হয়। বাঁশের গায়ে রঙিন কাপড় জড়িয়ে কৃত্রিম চুল লাগিয়ে দরগার চারপাশে নাচানো হয়। ধারণা এই যে, এতে মানতকারীর বাসনা পূর্ণ হয়। 'বাঁশ নাচানো' আচারটিতে তিনটি বাঁশ গাজীর থানে পুঁতা থাকে। মধ্যের বাঁশটি বাকি দুটি থেকে অপেক্ষাকৃত লম্বা রাখতে হয়। লম্বা বাঁশটিই গাজীর প্রতীক। সব বাঁশের মাথায় চামর বাঁধা থাকে। অনুষ্ঠানের দিন একজন দক্ষ ব্যক্তি বাঁশটিকে মাটি থেকে তুলে নাচের ভঙ্গিতে সাতবার থান প্রদক্ষিণ করেন এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গাজীর মহিমা-কীর্তন করেন। কোন কোন স্থানে বাঁশটিকে নাভির উপর বসিয়ে নাচানোর প্রসঙ্গ সম্পর্কে আমাদের অবগত করিয়েছেন লোকসংস্কৃতিবিদ ওয়াকিল আহমেদ।

গাজীর বাঁশ বিয়া বিলুপ্ত প্রায় গাজীকেন্দ্রিক একটি আচার। অতীতে আচারটি সুন্দরবন অঞ্চল সহ খুলনা, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে বহুল প্রচলিত ছিল। জানা যায় যে, সেসময় গাজীর বাঁশের সাথে যে মানব কন্যার কৃত্রিম বিবাহ দেওয়া হত এই কন্যাকে ফকিরি জীবন-যাপন করতে হতো। সাধারণত মৃতবৎসার কন্যা সন্তান হলে সেই কন্যার সঙ্গে বাঁশের বিয়ে দিয়ে ফকিরি জীবন-যাপনে বাধ্য করা হতো। এই আচারটির সঙ্গে হিন্দু সমাজে প্রচলিত 'দোবধরা' প্রথার মিল খোঁজে পাওয়া যায়। এর মূল উদ্দেশ্য হল এই সন্তান যেন গ্রহদোষ বা মৃত্যুযোগ কাটিয়ে দীর্ঘজীবী হয় এবং বংশের পরবর্তী প্রজন্মকে জন্ম দিতে পারে। তাছাড়া 'বাঁশ বিয়ে' আচারটির সঙ্গে সন্তানের দীর্ঘায়ু কামনাও জড়িত। সর্বোপরি এই আচারের সাথে বাঙালির উর্বরতা তত্ত্বের বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত।

।। পাঁচ ।।

সাধারণভাবে গাজীর বন্দনা, গাজীর বীরত্ব, লড়াইয়ের বর্ণনা, শৌর্যবীর্যের কাহিনি নিয়ে যে গান গাওয়া হয় তাকে গাজীর গান বলে। কারো কারো মতে আবার গাজীর গান হল জ্ঞানীর গান। সুন্দরবন অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই গাজীর গানের বিস্তৃতি। সুন্দরবন ছাড়া গাজীর গানের আলোচনা পূর্ণ হয় না। গাজীপীরের মাহাত্ম্য ও বন্দনামূলক গানই গাজীর গান। গাজীর গান ভাটি অঞ্চলের মানুষের নীতিশিক্ষার অন্যতম একটি মাধ্যম। পূর্বে শুধু গাজীপুর অঞ্চলে এই গানের প্রচলন ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে ভিন্ন রূপে ভিন্ন আঙ্গিকে ভিন্ন বিষয়বস্তুতে বাংলার বহু অঞ্চলেই গাজীর গান বিস্তৃতি লাভ করে। গানগুলি ইঙ্গিতপূর্ণ, উপদেশমূলক, আত্মনিবেদনমূলক। দক্ষিণরায়, বনবিবির পর্যায়ভুক্ত গাজী পীরের গানও হিন্দু ও মুসলিম জন জীবনে মুক্তি দাতা হিসাবে তাঁদের ধ্যান-জ্ঞান স্বরূপ। গাজীপীর সুন্দরবনের জনজীবনে মানুষের ভালো-মন্দ, উন্নতি-অবনতি, ছেলে-মেয়ের বিয়ে, সুখ-শান্তি সব কিছুর মাঝে অবস্থান করেন। গাজীপীর তাঁদের কাছে প্রাণস্বরূপ। এই প্রাণস্বরূপকে তাঁরা গানের মাধ্যমে বন্দনা ও লীলা কীর্তন করে। গাজীর গান অঞ্চলভেদে গাজীর গীত, গাজীর পালাগীত, গাজীর গাইন, পীরের গান, গাইনের পালা, গাইনের

গীত, গাইনের তামাশা ইত্যাদি নামে পরিচিত। হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই সন্তান জন্ম হলে, পরীক্ষায় পাশ করলে, রোগ মুক্তির কামনায় গাওয়া হয় গাজীর গান।

গাজীর গানকে আনুষ্ঠানিক দিক থেকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলো হলো— (১) গাজীর মাহাত্ম্যমূলক গান (২) গাজীর পালাকেন্দ্রিক গান এবং (৩) গাজীর পটকেন্দ্রিক গান। গাজীর মাহাত্ম্যমূলক গানে গাজীপীরের অলৌকিক কৃতকর্ম, মানব সেবামূলক কর্ম, বীরত্বমূলক কাহিনি, দুঃখ-দুর্দশা থেকে মানুষের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে তাঁর করুণাময় কর্মকাণ্ড সুরের মাধ্যমে গাওয়া হয়। গাজীতত্ত্বকে ভিত্তি করে এপার বাংলা ও ওপার বাংলায় নানা পালা-উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়েছিলো। এর সঙ্গে রচিত হয়েছিল পালাকেন্দ্রিক নানা গীত। গাজীপটে অঙ্কিত চিত্রের আলোকে যে গান রচিত হয়েছিল সেগুলো গাজীপট কেন্দ্রিক গান। তবে পালা ও পটকেন্দ্রিক গানে গাজীর মাহাত্ম্যমূলক গানের বিভিন্ন পর্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময় গাজীর গানের সকল পালাতেই মূখ্যত অধ্যাত্মবাদ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, আনুগত্য, আত্মসমর্পণ, ইহকালীন কল্যাণ প্রভৃতির বর্ণনা। পারিপার্শ্বিক ঘটনা, সামন্ত প্রভুদের অত্যাচারের প্রসঙ্গও বিষয় হিসেবে স্থান পেয়ে গেছে গাজীর গানে।

গাজীর গানের প্রধান উপজীব্য বা বিষয় মূলত গাজীপীর এবং তার ভ্রাতৃপ্রতিম সহচর কালু। তাছাড়া গাজীপীরের মুরশিদের পথ অনুসরণ, সামাজিক নানা অসংগতি, চন্দ্রাবতীর সঙ্গে প্রণয় কাহিনি, সমাজের আর্থ-সামাজিক রূপ গাজী গানে স্থান পেয়েছে।

অতীতে হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজে গাজীর গান শুরুর পূর্বে গাজী পূজার আয়োজন এবং আসন তৈরি করা হত। পূজার বিভিন্ন উপাচার দিয়ে গাজীর থান তৈরি করা হত। পূজার আয়োজন শেষ হলে গাজীর দলের লোকদের জন্য আসন পেতে দেওয়া হত। গায়েন, নাটুয়া বালক, দোহারি, বাদক নিয়ে গাজীর দল গঠিত হত। বিচিত্র ধরনের রঙিন পা-জামা ও ঢোলা-লম্বা আচকান পরে মাথায় পাগড়ি বেঁধে গাজীর গানের মূল গায়েন আসরে নামতেন। আসরে নামার পর ঢোলের আওয়াজে শুরু হত গাজীর গীতের বিভিন্ন পর্যায়। প্রথমেই গাওয়া হতো বন্দনা গান। উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতা এই বন্দনা রীতিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে শ্রবণ করতেন। বন্দনা পর্যায়ের একটি গান এরূপ –

"পথমে উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত
তার ওপরে নাইতো কোন মানুষের বসত
পূর্বদিকে বন্দনা করি সূর্যদেবীর পায়
একদিকেতে ওঠে সূর্য্য চৌদিকে পর্সায়।
দক্ষিনে বন্দনা করি ক্ষীর নদী সাগর
সেহ খানেতে চালায় তরী যত সাধুমহাজন
পশ্চিমে বন্দনা করি হজ্জ মক্কার খর

সেই খানেতে নামাজ পড়লে বান্দার গুনা
হয়রে মাপ
চাইরদিকে বন্দনা করে আসর করলাম ঠিক
মন দিয়ে শোনবেন আপনার
গাজি দুঃখের গীত"।[২]

কখনও কখনও গায়েন-খলিফা আল্লাহ ও রসুলের প্রশস্তি-মূলক গান গাইতে আরম্ভ করেন —

"আল্লাহ আল্লাহ বলো ভাই রসুল বলো মুখে
ছাড়িও দুনিয়ার ধান্দা বেস্ত যাইবার সুখে
আল্লার নাম লও ভাই বদন ভরিয়া একবার।"[৩]

গাজী পীরদের উদ্দেশে বন্দনা অংশে দেখা যায় সমন্বয় সাধনাকেন্দ্রিক নানা প্রসঙ্গ। গাজীর গায়েনরা মূলত ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তবুও ইসলামের মৌলিক নীতির পরিপন্থী হিন্দু দেবদেবীকে গীতের মাধ্যমে বন্দনা করার প্রমাণ পাওয়া যায় কিছু গানে। এরূপ একটি গান —

"পূর্বেতে বন্দনা গাইলাম পূর্ব উদয়ভানু
রাধিকার অঞ্চলো ধরি বিদায় মাঙ্গইন কানু।
উত্তরে বন্দিয়া গাইলাম উত্তর সিংহাসন
ঊনকোটি দেবগণে পাতিছইন আসন।
পশ্চিমে বন্দিয়া গাইলাম মক্কা বানস্থান
যেই জাগাতে পয়দা অইছন কিতাব আর কোরাণ।
দক্ষিণে বন্দিয়া গাইলাম কালিদহ সাগর
পদ্মার বিবাদে চান্দের চৌদ্দ ডিঙ্গা তল।
আও গো সরস্বতী কণ্ঠে কর ভর
জানি কি না জানি মা গো কালাম জুআও মোর।
শুনগো সরস্বতী মাই বলি যে তোমারে
কামাখ্যার দোহাই দিয়া ডাকিয়া ফিরি তোরে।।[৪]

বন্দনা পর্যায়ের গানের পর শুরু হয় গাজীর মাহাত্ম্য বা অলৌকিক শক্তি মূলক, বিভিন্ন ঘটনাকেন্দ্রিক, পার্শ্বচরিত্রকেন্দ্রিক গান। বাংলার স্থানভেদে এসব গানের নানাবিধ পাঠান্তর এবং গাজীর মাহাত্ম্য ও অলৌকিক বিষয়ক বর্ণনায় তফাত দৃষ্ট হয়। গাজীর গান গাজী পীরের উদ্দেশে নিবেদিত কৃত্য নাট্য হলেও এর শিল্পরস কৃত্যের সীমা অতিক্রম করে আধুনিক শ্রোতাকে ধর্মের ভেতর থেকে এক মানবীয়লোকে আহ্বান করে। গাজী পীরের জীবন কথা ও অন্যান্য চরিত্র নির্ভর গানগুলো অসাম্প্রদায়িক এবং এগুলো সপ্তদশ

শতকের বাঙলার হিন্দু-মুসলমান সমাজে পূজিত গাজী পীরের লৌকিক-অলৌকিক কাহিনিকেন্দ্রিক কৃত্য 'পীর পাঁচালি'।

বন্দনা, গাজীর জন্মবৃত্তান্ত, দৈত্য-রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ, রোগ-মহামারি ও নানা বিপদ-আপদ, দুষ্ট আত্মার সঙ্গে যুদ্ধ, অকূল সমুদ্রে ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে পুণ্যবান উত্ত সওদাগরের নৌকা রক্ষা ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করে গাজীর গান গাওয়া হয়ে থাকে। উল্লেখিত হয়েছে যে কালু গাজীর সহচর। গাজীর গানে সেই সহচর কালুকে দেখানো হয়েছে এক ব্যাঙ্গাত্মক চরিত্ররূপে। শ্লেষাত্মক কথার মাধ্যমে সমকালীন দেশ এবং সমাজের প্রতিচ্ছবি কালুর কথায় উঠে আসতে দেখা যায় অনেক গানে। মূল কাহিনির সঙ্গে কোন সূত্রেই সংযোগ না থাকলেও আঞ্চলিক, আর্থসামাজিক এবং সমাজ সচেতনতার প্রকাশ অনেক গাজীর গানেই মূর্ত হয়ে ওঠে—

"আমাদের দেশটা চোরের খনি
সবই আমরা করতে পারি
চালচুরি, আটা চুরি, গরুচুরি
... ...
সবই আমরা করতে পারি
খেলার সময় খেলা করি
কাজের সময় চুরি করি
কোনটা আমরা কম পারি।"[৫]

গাজীর গানে আছে মুর্শিদি প্রসঙ্গ। গাজী, কালু, রাণী, দাসী, দাসীর সখি, বাদশা ইত্যাদি গানের কথায় ভেসে ওঠা চরিত্রের নেপথ্যে থাকে মুর্শিদ এবং বাদশা চরিত্র। ঘর-সংসার ত্যাগ করে পাঁচবছর বয়সে গাজী পীর বনে গিয়ে মুর্শিদের সাধনায় প্রভাবিত ও আপ্লুত হয়েছিলেন, এমন প্রসঙ্গও অনেক গীতের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠেছে,—

"হই ওরে মুর্শিদ দেখে যাও
তোমার ভক্ত দয়ার গাজি
কান্দিতে লাগিল
মুর্শিদ তুমি দেখে যাও।"[৬]

লোককথায় আছে, পীর জিবরাঙ্গল ওরফে মুর্শিদ গাজীর গুরু ছিলেন। মুর্শিদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর গাজীর শরীরে চারটি অজপা গুণ - নির্ধনে ধন দান, অপুত্রককে পুত্র দান, মৃত বৃক্ষকে জীবনদান এবং কামসিদ্ধি দান করেন মুর্শিদ। গাজীর গীতের ভাষায়, —

"মুর্শিদ আমার মন বোঝে না
একলা দুনিয়ার ফকির হলাম

দোসর পেলাম না
আমি আসি বলতে পারি
যেতে বলতে পারি না
ও সাধের বেলা ডুবে গেলরে
পাগলমন চেয়ে দেখলিনা
পুবের বেলা পশ্চিমে গেল।"[৭]

ইসলাম ধর্মাবলম্বী গাজী গানের গায়কদের পাশাপাশি হিন্দু সমাজেও একটা সম্প্রদায় (যাঁরা 'উদাসী' বলে গণ্য হতেন) গাজী গানের গীতিকার ছিলেন। তাঁরা সমাজকেন্দ্রিক নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে শ্লেষাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক নানা গান রচনা করতেন,—

"কোথায় যাও আমারে ফেলায়ে, ঠাকুর হে —
ও ঠাকুরহে, হয়েছিল নয়া-বাড়ি
শিশুকালে হইয়াছি রাঢ়ি গো
আর তোমারে আনিলাম কত কিল গুতা খাইয়া
ঠাকুর হে, কোথা যাও আমারে ফেলাইয়া
ও ঠাইরান গো, বিয়া হইছিল কুমড়া খালি গা'ত্র
তোমারে পরাইলাম শঙ্খ, শাড়ি
ও ঠাইরান গো, কোথা যাও আমারে ফেলাইয়া।।
আর তোমার রূপ দেইখা আমি হইলাম পাগল গো।"[৮]

মুসলিম সমাজের গাজী গাইয়েনদের মুখেও শোনা যায় এরকম কিছু গীত। গানগুলো নিছক সময় কাটানোর মেঠো গান হলেও এগুলোতে ঐতিহাসিক সত্য ও তথ্যের সন্ধান মিলে;—

"মরি হায়, হায়রে মোল্লা হায়, এখন কী করি উপায়?
ঐ মুরগীর গর্জনে আমার পরান উইড়্যা যায়।
উস্তা বেচতে গেলাম চাচা খলিফার বাজারে
(আর) ময়দায় পাথারে পাইয়া কিলাইলাম চাচারে।
এক পয়সার মিঠাই কিনিয়া পথে যাইলাম খাইয়া
বাড়ি আইলাম পরে বউয়ে কিলায় গায়ের গন্ধ পাইয়া।"[৯]

সময়ের সাথে সাথে গানের বিষয়ে নতুন নতুন উপাদানের সাঙ্গীকরণ লোকসংস্কৃতির এক বৈশিষ্ট্য। গাজীর গীতেও এর প্রমাণ মেলে—

"শাশুড়ি বউ ঝগড়া করে গুয়া বাগানে
বাঘু মারিতে যায়বে গাজী জঙ্গলের ভিতরে
চৌদ্দশ মারিয়া গাজি থলিয়াতে ভরে।

বাঘের পিঠে বাড়ি দিল হুঙ্কার করিয়া
ভাইর পুতের বৌরে বাঘে নিল খোপায় কামড় দিয়া।
গোয়ালিয়ার পোলায় যায় দধির ভার লইয়া
তিন মাসের বাছুর ফেলে চেঙ্গরা বাঘে খাইয়া।
ঝিয়েরে না দিয়া বুড়ি নাতিরে না দিয়া
চৌদ্দ কুড়ি পিঠা খাইছে খেতা মুড়ি দিয়া।
কামের কথা শুনলে মাগীর গায়ে উঠে জ্বর
বিয়ার কথা শুনলে বুড়ি খুশিতে জরজর।
হায়রে আবাগ্য বুড়ী খোপার লাগি কান্দে
কচু পাতার ডিবলা দিয়ে মস্ত খোঁপা বান্ধে।"[১০]

পরবর্তীতে একসময়ে গাজীর গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষা করে অর্থ উপার্জন শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে জানা যায়, বেদে সম্প্রদায়ের কিছু লোকরা গ্রামে, বাজারে, হাটে গিয়ে উপার্জন করতো। কোন কোন বেদে গায়েনদের সঙ্গে থাকতো পটচিত্রও। ভিক্ষা প্রসঙ্গমূলক একটি গাজীর গান—

"কালু ঘোষের মা বলে নন্দ ঘোষের ঝি
গাজীর ফকির বাড়ি আইছে ভিক্ষা দিবা কি?
এই দু'টো ধান দিচো মা, তা তো নেবো না
আর যদি না দ্যাও মা, বেজার কইরা নেবো
নিজ হস্তে দান করো মা, পরকালের কাম।
ঘর বাড়ি দালান কোঠা সব রবে পড়িয়া
একা একা রবি রে মা, শশ্মানে পড়িয়া।"[১১]

।। ছয় ।।

বঙ্গদেশের গাজীকেন্দ্রিক সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটা অঞ্চলে গাজী গীতের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে নানা নীতিবাক্যমূলক ছড়া, প্রবাদ, মন্ত্র এবং কিংবদন্তি। সমাজের নানা অনুষঙ্গ, অভিজ্ঞতা, করণীয় কর্ম, বাধা নিষেধ ইত্যাদি স্থান পেয়েছে নীতিবাক্য ও প্রবাদগুলোতে। এরকম দু-একটি প্রবাদ ও নীতিকথা—

(১) "যে জন শুনে গাজী বাবার গান
দেশে-বিদেশে বাড়ে তার নাম ও সম্মান।"

(২) "কালু পীর, মানিক পীর আর বড়-খাঁ পীরের কথা
সমাজে তারাই বাচাইয়া রাখছে মোদের মাথা।"

(৩) "রান্ধিয়া-রান্ধিয়া অন্ন পুরুষের আগে খায়

ভরানা কলসের পানি তিরাসে শুকায়
দুবদুবাইয়া হাঁটে নারী চোখ ঘোরাইয়া চায়
অলদীরে দিয়া ঘরে লদী লইয়া যায়।"

গাজীর গানের মাধ্যমে অর্থ আয়ের প্রসঙ্গও গাজীকেন্দ্রিক একটি ছড়ায় স্পষ্ট—

"ভাল কামাই করলাম
গাজীর গীত গাইয়ে
তিন টাকা কামাই কড়লাম
চৌদ্দ শিকে যাইয়ে।"[১২]

অলৌকিক শক্তির কাছে মাথা ঠেকানো লোকসমাজের এক সহজাত প্রবৃত্তি। লৌকিক পীর গাজীবাবার উপরও মানুষের এই বিশ্বাস সুদূর অতীত কাল থেকে টিকে আছে। শোনা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের কিছু অঞ্চলে আজও শারীরিক নানা ব্যাধিতে গাজীবাবার আশীর্বাদ ধন্য হওয়া যায়। লোকশ্রুতি মতে— কিছু কিছু অঞ্চলে গাজীবাবার দোহাই দিয়ে অনেক তুক্তাক ও মন্ত্রতন্ত্র আজও বর্তমান আছে। এরকম একটি মন্ত্র হলো—

"অগ্নিকুণ্ড বান, ব্রহ্মকুণ্ড জাতি, হাকুমের ব্যাথা কেটে
করি খান খান
কার বাণে কাটি, শ্রীরামের বাণে কাটি।
কার আজ্ঞায় বাবা দেওয়ান, গাজীর আজ্ঞায়
বাবা মোবারক গাজীর আজ্ঞায় বাবা
বরকান গাজীর আজ্ঞায়, অমুকের অঙ্গের ব্যাথা
শিগগির যা।"[১৩]

বাংলা লোকসাহিত্য ভাণ্ডারে লোককথা কিংবা লোকপুরাণের সঙ্গে তুলনা করলে কিংবদন্তির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কমই পাওয়া যায়। কিংবদন্তি হলো একধরনের লৌকিক কাহিনিমূলক গল্প যার ভিতর ইতিহাসে ঘটা কোনো ঘটনার ক্ষীণ সূত্রের সন্ধান মিলে। কিংবদন্তিগুলোতে সম্ভব-অসম্ভবের গল্প স্থান পায় এবং মুখে মুখে প্রচারিত হয়। গাজী পীরকে নিয়ে বঙ্গদেশের অনেক অঞ্চলে নানা কিংবদন্তি শোনা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কিংবদন্তির মধ্যে ইতিহাসের সত্যরূপ অবশ্যই থাকে কিন্তু পরবর্তীতে পল্লবিত হতে হতে তার ইতিহাস মুছে যায়। থাকে শুধু সম্ভব-অসম্ভবের এক অপরূপ কাহিনি। লৌকিক দেবতা/পীর হিসেবে গাজীর প্রতিষ্ঠা, চম্পাবতীর সঙ্গে মিলন ও বিবাহ, বাঘের দেবতা হিসেবে পরিচয় লাভ ইত্যাদি প্রসঙ্গে নানা কিংবদন্তি গাজী পীর/গাজী বাবার প্রভাব অধ্যুষিত বাংলার নানা অঞ্চলে বিভিন্ন কাহিনির অনুষঙ্গে বর্তমান। কিংবদন্তিকে আশ্রয় করে রচিত কিছু গীত এসব অঞ্চলে দুর্লভ নয়। গাজীর গীতাশ্রয়ী ও কাহিনিমূলক কয়েকটি কিংবদন্তি এরকম—

"হারে দোম দোম বলিয়া গাজী ছাড়িল জীগির
নন্দ ঘোষের মায় বলে এই আইল ফকির।।
নন্দ ঘোষের মায় বলে কালুঘোষের ঝি
বাড়ী আইন গাজীর ফকির ভিক্ষা দেব কি।।
ভিক্ষা করতে আইছি আমি ভিক্ষা লইয়া ফিরি
বাটায় করিয়া আন চাউল পয়সা কড়ি।।
দধি দুগ্ধ থাকে যদি গাজীর থানে দেব
সিন্নী দিয়া গাজীর নামে দোয়া কইরা যাব।।
তখন, সুদ্ধি গোয়াইলার মাইয়ার কুবুদ্ধি জাগিল
ছিয়ার উপর দৈ থুইয়া মিথ্যা কথা কইল।
ফকির বলে মিথ্যা কথা কইলি গাজীর থানে
ইহার সাজা দিব আমি গোয়াইলার বাতানে।।
ঘরে মইল গোয়ালিনী, আতালে মইল গাই
হাইলা গরু মইল কত ল্যাকা জোকা নাই।।
গোয়াইলা তখন কাইন্দা কাইট্টা গেল গাজীর কাছে
গাজীর নামে হাজত দেব গরু যদি বাঁচে।
তখন দোম দোম বলিয়া গাজী, পিষ্ঠেদিল বাড়ি।
সাত দিনের মরা গরু হাইটা ওঠল বাড়ী।"[১৪]

বঙ্গদেশে বড় খাঁ গাজী/গাজীপীর-এর সঙ্গে রাজকন্যা চন্দ্রাবতীর বিবাহকেন্দ্রিক কিংবদন্তিটি এরূপ —

"পাঁচ বছর বয়সে গাজীপীর গৃহ ত্যাগ করেন। গৃহ ত্যাগ করে মুরশিদের বরে গাজীপীর অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন এবং বনে-জঙ্গলে ঘুরে ফকিরি জীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে ছাপাই নগরের মুকুট রাজার কন্যা চম্পাবতীর প্রেমে পড়েন। গাজী চম্পাবতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে ভ্রাতৃস্বরূপ কালু পীরের মাধ্যমে মুকুট রাজার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। এই প্রস্তাবে রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে কালুপীরকে বন্দি করেন। ফলে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে গাজী পীর অসংখ্য বাঘ নিয়ে নদী পার হয়ে মুকুট রায়ের রাজধানী আক্রমণ করেন। মুকুট রায়ের পক্ষে সেনাপতি দক্ষিণরায় কুমির নিয়ে গাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেন এবং হাতের মুগুর দ্বারা গাজীপীরের দণ্ডটি ভেঙে ফেলেন। পরবর্তীতে অলৌকিক শক্তির বলে গাজী যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং চম্পাবতীকে নিজের করে নেন। সুন্দরবনে দক্ষিণরায়ের পাশাপাশি লৌকিক দেবতা রূপে মান্যতা পান।

।। সাত ।।

গাজী সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে নানা পুথি ও পাঁচালি সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে। এই পুথি পরবর্তীতে পালাগানের বিষয় হয়ে উঠেছে। গাজী পীর বিষয়ক সবচেয়ে প্রাচীন পুথির রচনা কাল ১৯৭৮-৯৯ সাল। খোদ বখ্‌শ এই পুথির রচয়িতা। তাছাড়া সৈয়দ হালুমীর ১৮২৭ সালে, আব্দুর রহিম ১৮৫৩ সালে, খোন্দকার মাহমুদ আলি ১৮৭৮ সালে, মহম্মদ মুন্সী ১৮৯৬ সালে এবং আব্দুল গফুর বিশ শতকের গোড়ার দিকে পুথি রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।[১৫]

যদিও পুথি ও পাঁচালিকে ভিত্তি করে গাজীপীরের পালা রচিত তবুও গাজীপীরের পুথি ও পালার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। পালাসমূহ সংখ্যায় যেমন প্রাচুর্যের দাবিদার বিষয়বস্তুতেও তেমনই বৈচিত্র্যময়। লোকসমাজ আপন জীবনের অনুকৃতির সাথে সাদৃশ্য রেখে নতুন নতুন পালা তৈরি করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বঙ্গদেশের প্রায় সব অঞ্চলে যেহেতু গাজীপীর, কালুপীর, মানিকপীর, চম্পাবতী প্রমুখ চরিত্রের নানা ঘটনা বিস্তৃত, তাই সুনির্দিষ্ট করে এর পালা সংখ্যা নির্ধারণ করা কঠিন। তবে, সমগ্র বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে গাজির সাতটি পালা সমধিক পরিচিত। পালাগুলো হলো—

- গাজী-কালু-চম্পাবতীর পালা
- নিজাম ডাকাতের পালা
- কাফন চোরার পালা
- ভেলুয়া সুন্দরীর পালা
- জামাল বাদশার পালা
- দিদার বাদশার পালা
- বাহরাম বাদশার পালা

গাজীর অনুষ্ঠান, গান ও পালা উপস্থাপনের সঙ্গে নৃত্যকলা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। লোকনৃত্যের একটি প্রাচুর্যময় ধারা গাজী। গাজী দলের মূল ব্যক্তিকে খলিফা বলা হয়। তাঁর সঙ্গে থাকেন অন্যান্য সহ শিল্পীরা। খলিফা অর্থ প্রতিনিধি। "গাজী সাহাব নিজে নাচও জানে, তবুও এ-দায়িত্ব পালন করে তাঁর সাক্‌রেদরা। গাজী সাহাবদের সঙ্গে একাধিক ব্যক্তি থাকেন সর্বক্ষণের সঙ্গী। এই সব সাক্‌রেদ বা চেলাদের মধ্যে বিশেষ এক নির্বাচিত ব্যক্তি থাকেন, বলা যেতে পারে তাঁকে তৈরি করে নেওয়া হয়। ঐ ব্যক্তিটির থাকে বিচিত্র পোশাকের সংমিশ্রণ। এক হাতে চামর অন্য হাতে থাকে একটি যষ্ঠী। যষ্ঠীর মাথায় থাকে চান্দ-সুরজ-তারা। গলায় স্ফটিকের মালা, হাতে হাতকড়া, পায়ে ঘুঙুর, মস্তক অনাবৃত। তাঁর সঙ্গীদের একজনের থাকে পদ্মাপুরাণের ওঝা নাচের ঘাগরার মতো পোশাক, গায়ে জামা ওয়াচ কোট। মাথায় ফেজটুপি। চামরবাহিত ব্যক্তি গাজী সাহাবের গানের সঙ্গে নৃত্য করেন।"[১৬]

গাজী নৃত্য দুভাবে পরিবেশন করা হয়ে থাকে। দুজন খলিফা সহ একজন ব্যক্তি গাজীর ভূমিকায় নৃত্য ও অভিনয় করেন। তাছাড়া গাজী ছাড়া শুধু একজন খলিফাই গাজী নৃত্য পরিবেশন করেন। গাজী নৃত্য শিল্পীর এক হাতে থাকে একটি পাখা অন্য হাতে থাকে লাঠি। গাজীর গীতের মতোই গাজীর নৃত্যে নানা বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয় এবং গাজীর থানে ধর্মীয় রীতিতে নানা উপাচার উৎসর্গ করে গাজীর নৃত্যের অনুষ্ঠান শুরু হয়। গাজী নৃত্য মূলত দুটি উদ্দেশ্যে পরিবেশিত হয়। সেগুলো হলো— (ক) মনকামনা পরিপূর্ণতায় প্রতিশ্রুত গাজীর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে এবং (খ) নিছক বিনোদনের জন্য। গাজী নৃত্য আসলে গান ও নাচের সমন্বিত অনুষ্ঠান। ঘাগরা পরে খলিফা একাই নাচ ও গান করেন। তাঁর দুটি হাতে রুমাল বাঁধা থাকে। গাজী নৃত্যের পদ চালনা খুবই সহজ ও ছন্দায়িত থাকে। নৃত্য বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এটি একক বা দ্বৈতনৃত্য হিসেবেই পরিচিত।

।। আট ।।

পটচিত্রের ইতিহাস অনেক কালের। অনেকে বলেন প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের। সংস্কৃতে কাপড়কে বলে 'পট্ট'। কাপড়ে আঁকা ছবি হলো পটচিত্র। যাঁরা আঁকেন, তাঁরাই পটুয়া। এই পটচিত্র দুই রকমের। একটির কথা শুরুতেই বলা হয়েছে, লম্বা কাপড়ে খোঁপ খোঁপ করে ধারাবাহিকভাবে কোনো গল্প বা আখ্যানের ছবিগুলো আঁকা হয়। একে বলে 'জড়ানো পট'। এগুলো সাধারণত ১৫ থেকে ৩০ ফুট পর্যন্ত লম্বা আর ২ থেকে ৩ ফুট পর্যন্ত চওড়া হয়ে থাকে। আর এক রকমের পটচিত্র আছে। সেগুলো চৌকোণ বর্গাকৃতির পটে আঁকা। এ-গুলোকে 'চৌকোপট' বলে। পট আর তার রং সবই স্থানীয় উপকরণে তৈরি হয়। কাপড়ে কাদামাটি, গোবর, তেঁতুল, সিরিশের আঠা এসবের প্রলেপ দিয়ে পট তৈরি করা হয়। লাল, খয়েরি, নীল, হলুদ, বাদামি, গোলপি, কালো ব্যবহার করা হয়। এসব উজ্জ্বল রংও তৈরি হয় কাঠ-কয়লা, পোড়া চাল, খড়িমাটি, ঝুলকালি, কাজল, সিঁদুর, আলতা, পাকা তেলাকুচা, কাঁচা হলুদ প্রভৃতির সংমিশ্রণে। আঁকার জন্য বাঁশের কঞ্চির সঙ্গে পশুর লোম (সাধারণত ছাগলের) বেঁধে নিয়ে তুলি তৈরি করা হয়। পটের ছবির প্রধান বৈশিষ্ট্য এগুলোর সরলতা। দ্বিমাত্রিক এসব ছবির মুখগুলো প্রধানত পাশ থেকে আঁকা। গতিময় স্পন্দিত রেখা ছবিগুলোকে এনে দেয় অসাধারণ দৃঢ়তা। পাশাপাশি এর উজ্জ্বল রং পটের ছবিতে যে নান্দনিক ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে, তা খুব সহজেই দর্শকদের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গাজী পীরের চরিত্র ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে পট শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। গাজীর পট পরবর্তীকালের সংযোজন। এটি মানুষের নীতি শিক্ষার একটি অন্যতম মাধ্যমও। সমকালীন সাময়িক ঘটনাবলীর ভিত্তিতে এবং কাল্পনিক আখ্যানে গাজীর পটগুলো সৃষ্ট। গবেষকদের মতে, বৌদ্ধ আমলে পটচিত্রের প্রচলন থাকলেও

গাজীর পট পনের-ষোল শতকে চালু হয়েছে। সুন্দরবনে গাজীপীরের আর্বিভাবের পর তাঁর বীরত্ব গাথা ও আবির্ভাব কাহিনি বঙ্গদেশের সব অঞ্চলেই প্রসার লাভ করে। তখন পটুয়া শিল্পীরা ব্যবসায়িক স্বার্থে পটচিত্রের মাধ্যমে চিত্রিত করে এই ধারার চিত্রকলায় নতুনত্ব আনেন। গাজীর পটে নানা ধরনের ঘটনা কালে কালে স্থান পেয়েছে। তবে গাজী পীরের ছবি, দুই অনুচর কালুপীর ও মানিকপীর এবং বাঘের ছবি প্রায় সব পটেই দৃষ্ট হয়।

বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা সহ নিম্নাঞ্চলের বেদে সম্প্রদায়ের লোকরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে পটচিত্র দেখিয়ে গান করত। মূলত তাঁদের গান গাওয়ার সময় কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস। কিন্তু উপার্জনের তাগিদে অনেক সময় তাঁরা অন্য মাসেও গাজীর পট দেখিয়ে গান গাইতো। তখন গায়েনরা গাজীর পটের উপর ভিত্তি করে 'অদিনে গাজীর পট' প্রবাদটি বলতেন। সিলেট অঞ্চলের মাইমাল মুসলিম সমাজেও গাজীর পট দেখিয়ে গীত গাওয়ার অতীত ইতিহাসের প্রসঙ্গ আমাদের অবগত করিয়েছেন ইতিহাসবিদ কামালুদ্দীন আহমেদ। তবে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চলের পট, পশ্চিমবঙ্গের পট এবং সিলেট অঞ্চলের পটের মধ্যে গঠনগত তফাত আছে বলে আমাদের অবগত করিয়েছেন গুরুসদয় দত্ত। বাংলাদেশের গাজীর পট সাধারণত চৌকো পট। পশ্চিমবঙ্গের পটগুলো জড়ানো পট। সিলেট মূলে উভয় ধরনের পটই ব্যবহৃত হত। পূর্ববঙ্গের গ্রামের দ্বারে দ্বারে পটচিত্র নিয়ে উপার্জনের উদ্দেশ্যে গানের সহযোগে যেগুলো ব্যবহার করতেন সেগুলো ছিল অনেকটাই স্বতন্ত্র।

গাজীর পটের ব্যবহার কেবল বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ সন্নিহিত পশ্চিমবঙ্গের কিছু অঞ্চলে রয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে বরং পটের অন্য বিষয় যেমন যমপট, চণ্ডীপট, চক্ষুদান পট প্রভৃতি বিষয়গুলো সম্প্রসারিত হয়েছে। এখানে গাজীর পট ধর্মসাধনার শিল্পপ্রকাশ নয়, নিছক শিল্পখেলা বা লোকরঞ্জনও নয়। গাজীর পটকে বলা যায়, বাংলা বিশেষত পূর্ববঙ্গের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের অনিবার্য শিল্পস্বর।

আসাম রাজ্যের দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত 'বরাক উপত্যকার' লোকসমাজেও গাজীকেন্দ্রিক বিশ্বাস সংস্কার ও নৃত্য-গীতের প্রচলন ছিলো বলে বিশিষ্ট্য নৃত্যশিল্পী মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য ও ইতিহাসবিদ কামালুদ্দীন আহমেদ অবগত করিয়েছেন। তবে আহমেদ মহাশয় বরাক উপত্যকার মুসলমান সম্প্রদায়ের কৃষক শ্রেণিভুক্ত 'মাইমাল' নামক একটি সামাজিক উপশ্রেণির লোকেরাই গাজী নৃত্যের উপভোক্তা বলে যে সিদ্ধান্ত[১৭] দিয়েছেন, ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য মতে তা কোনেভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। গাজী নৃত্য-গীতের উপভোক্তা বরাকের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমাজের নিম্নমধ্য ও নিম্নবর্গীয় শ্রেণির লোকেরাও ছিলেন। বলাবাহুল্য, মনোরঞ্জন ও উক্ত নৃত্যশিল্পের প্রচার, প্রসারে অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বী নৃত্যশিল্পীরাও নানা গ্রামে গিয়ে অনেক কাল ধরে এই নৃত্য গীতটি উপস্থাপন করে আসছেন।

সূত্রনির্দেশ :

১। দুলাল চৌধুরী (সম্পা), লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অফ ফকলোর, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৪৯১-৪৯২।

২। রমজান আলী (তথ্যদাতা), বয়স-৪০, গ্রাম-দাসপাড়া, খুলনা থেকে ২০০৪ সালে শেখ গবেষক ওয়াজেদ রৌফ কর্তৃক সংগৃহীত।

৩। বেলা দাস, বিশ্বতোষ চৌধুরী (সম্পা), বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি। (কামালুদ্দীন আহমেদ বিশ্বায়নের যুগে বরাকের গাজিনৃত্য), অর্পণা বুক ড্রিসি, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১১৩।

৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১১৪।

৫। রমজান আলী, প্রাগুক্ত।

৬। প্রাগুক্ত।

৭। প্রাগুক্ত।

৮। চিত্তরঞ্জন দেব, পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ, ফার্মা.কে.এল.এম., কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ২৫৮-২৫৯।

৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮-২৫৯।

১০। আশরাফ সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড) গতিধারা, ঢাকা বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ৮৮।

১১। ওয়াকিল আহমেদ, লৌকিক জ্ঞান কোষ, গতিধারা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০১১, পৃ. ১১৯।

১২। প্রাগুক্ত,পৃ. ১১৯।

১৩। সনৎকুমার মিত্র (সম্পা), বাংলা গ্রামীণ নাটক, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ২২।

১৪। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য (তৃতীয় খণ্ড), ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬৫, পৃ. ৫১৬।

১৫। স্বরোচিষ সরকার, লোকনাট্য ও গাজির গান, শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্য ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা, জার্নাল, ২য় সংখ্যা, ২০০৫, পৃ. ১১২।

১৬। মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য, বরাক উপত্যকার লোকনৃত্য ও গ্রামীন নৃত্যকলা, প্রাসঙ্গিক প্রিন্টার্স, ১৯৯৫,শিলচর, পৃ. ৩৮।

১৭। বেলাদাস, বিশ্বতোষ চৌধুরী প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

বাংলার লোকঐতিহ্যে 'জারি'

।। এক।।

বাংলা লোকসঙ্গীতের দলগত পরিবেশনার একটি বিশেষ ধারা জারি গান। এটি পয়ার ছন্দে রচিত আখ্যানমূলক গাথা বা পাঁচালি। পার্শি বা উর্দু অভিধানে 'জারি' শব্দের অর্থ হল বিলাপ, শোকের প্রকাশ। কুমুদনাথ মল্লিকের মতে, জারি শব্দটি আরবি। সাধারণভাবে 'জারি' শব্দের অর্থ হল প্রবর্তন, প্রয়োগ, প্রকাশ, প্রচার বা জাহির করা। মূল আরবি শব্দ 'জাহিরী বা জহরী' থেকে জারি শব্দের উদ্ভব।[১] মহীউদ্দিন আহমদের মতে, The "Zari" derivation of "Jari" is translated in Parsian and Urdu dictionaries as "crying, groaning, wailing."[২] জারি শব্দটির উদ্ভব নিয়ে নানা বিতর্ক থাকলেও বঙ্গদেশে জারি গানের উদ্ভব নিয়ে কোনো বিতর্ক চোখে পড়ে না। জারি গান বাংলার ঐতিহ্যাশ্রয়ী লোক সঙ্গীতের বহমান স্রোতে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। এর সূচনা হয়েছিল 'আশুরা'র সূত্রে।

ইসলামী ইতিহাস অনুসারে, হিজরি ৬১ সনের ১০ই মহরম (১০ অক্টোবর, ৬৮০ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে, হজরত মহম্মদ (সাঃ)-এর দৌহিত্র ইমাম হোসেন কারবালা প্রান্তরে শহিদ হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে থেকে শিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। উল্লেখ্য হজরত মহম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুর পর যে চারজন খলিফা পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন, এঁদের মধ্যে চতুর্থ খলিফা ছিলেন, নবীর জামাতা হযরত আলী (রা.)। কিন্তু শিয়া মতাবলম্বীরা মনে করেন, হযরত আলী (রা.)-ই প্রকৃতপক্ষে প্রথম খলিফা। কিন্তু নবীর মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা.) খলিফা নির্বাচিত হতে পারেননি। পরের তিনজন খলিফার শাসনকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর, ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি এ পদে নির্বাচিত হন। সে সময় তৃতীয় খলিফা উসমানের (রা.) আত্মীয় মুয়াবিয়া (রা.) এর তীব্র বিরোধিতা করেন। হযরত আলী (রা.) ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে শাহাদত বরণ করলে, তাঁর পুত্র হযরত হাসান (রা.) খলিফা হন। কিন্তু তিনি মুয়াবিয়ার (রা.) কাছে খেলাফত ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এর কিছুপরে পরেই বিষ প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করা হয়। মুয়ারিয়ার (রা) মৃত্যুর পর হযরত হাসানের (রা.) ভাই হযরত হুসেনই (রাঃ) খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হবেন বলে অনেকে

আশা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু মুয়াবিয়ার (রা.) পুত্র ইয়াজিদ খলিফা হন। এই সূত্রে হযরত হোসেন (রা.) এবং ইয়াজিদের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত হিজরি ৬১ সনের ১০ই মহরম (১০ অক্টোবর, ৬৮০ খ্রিস্টাব্দ) ইয়াজিদের বাহিনীর কাছে কারবালা প্রান্তরে হযরত হোসেন (রা.) পরাজিত ও নিহত হন। হযরত আলী (রা.) ও তাঁর পুত্রদের সমর্থকরা একে এজিদের একটি ধর্মবিরোধী কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এই ভাবনা ধীরে ধীরে শিয়া মতবাদের জন্ম দেয়।

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে পারস্যে সাফভি বংশ ক্ষমতায় আসে। এই সময় শিয়া মতবাদ পারস্যে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনায় প্রচারিত হতে থাকে। সাফাভি শাসকরা শিয়া মতবাদকে পারস্যের রাষ্ট্রধর্ম করেন। এই সময় থেকে পারস্যে মর্সিয়া ও মাতমের দিন হিসেবে ১০ই মহরমকে মান্য করা হয়। তাঁরা এর নাম দেন 'আশুরা'। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর বঙ্গদেশে সামরিক অভিযান চালান। এই সময় তাঁর সেনাবাহিনীর সাথে বহু শিয়া মুসলমান বঙ্গদেশে আসে। এঁদের অনেক উচ্চ রাজপদে আসীন ব্যক্তিবর্গসহ সাধারণ সৈন্যরা বাংলাতে থেকে যান এবং ক্রমে বাঙালি হয়ে উঠেন। এঁদের উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতি হিজরি সনের প্রথম মাস মহরমের প্রথম দশ দিন কারবালার করুণ ঘটনাকে স্মরণ করে অনুষ্ঠানিক পর্ব পালনের সূচনা হয়। কালক্রমে এই অনুষ্ঠান ছড়িয়ে পড়ে সুন্নি-মুসলমানদের মধ্যেও। ফলে 'আশুরা' বঙ্গদেশে শুধু শিয়াদের অনুষ্ঠান না হয়ে, মুসলমানদের সকল গোষ্ঠীর কাছে একটি বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।

।। দুই ।।

সপ্তদশ শতকে বঙ্গদেশের মধ্যযুগের মুসলমান কবিরা ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নানা ধরনের কাব্য রচনা করেন। কবি মহম্মদ খান ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে 'মকতুল হোসেন' শীর্ষক কারবালা কেন্দ্রিক একখানি শোকগাথা রচনা করেন। এই গ্রন্থটি আখ্যায়িকা কাব্য হিসেবে পরিচিত। এক সময় এই গ্রন্থটি 'আশুরা' উপলক্ষে সুর করে পাঠ করা হতো। সেই কারণে এই গ্রন্থটিকে জারি গানের আদি নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কালক্রমে দীর্ঘ কাব্যগাথার পরিবর্তে স্থানীয় কবিয়ালদের অনেকে ছোটো ছোটো করে গান বাঁধতে শুরু করেন। এঁদের দ্বারা জারি গান সাধারণ কৃষিজীবী মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং এটি বাংলা লোকগানের অংশ হয়ে যায়। পরে আশুরার কাহিনির মতো, আরব-পারস্য অঞ্চলের বহু আখ্যানকাব্য বাংলা কাব্যজগতে ঢুকে পরে। ধীরে ধীরে এই ধারায় যুক্ত হয় জহর নামা, সাদ্দাদের জারি, শাহজালালের জারি, সোহরাব-রোস্তমের জারি ইত্যাদি আখ্যান। আরও পরে এর সাথে যুক্ত হয়েছে - সামাজিক, রাজনৈতিক,

ধর্মীয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ব্যঙ্গরসাত্মক বিষয়, পরিবার-পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ক জারি গান।

কবিয়ালরা যখন এই জাতীয় গান ছোট ছোট আকারে শোকের গান হিসেবে প্রকাশ করেন, তখন তাকে বলা হয় 'মর্শিয়া'। আর যখন বিস্তৃতভাবে সুর বৈচিত্র্যের মাধ্যমে পরিবেশন করেন, তখন তাকে বলে 'জারি গান'। অনেক সময় মূল কবিয়ালের সাথে কিছু সহযোগী শিল্পী ধুয়া ধরেন। তখন তা হয়ে যায় 'ধুয়া গান'। মূলত মহরম উপলক্ষে এ তিনটি ধারায়ই গীত পরিবেশিত হয়। বঙ্গদেশের সব অঞ্চলের মুসলমান সমাজে এর প্রচলন থাকলেও বিশেষ করে বাংলাদেশের মৈমনসিংহ জেলার নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে রাত ও দিনে এর আসর বেশি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

লোকসংস্কৃতিবিদদের অভিমত, প্রতিটি লোক আঙ্গিকের পেছনে একটি লৌকিক প্রেক্ষাপট ক্রিয়াশীল থাকে। প্রেক্ষাপট বিহীন লোকনাট্য, লোকনৃত্য বা লোকআঙ্গিক সৃষ্টি হয় না। জারি গানের ক্ষেত্রে সেই প্রেক্ষাপট হচ্ছে কারবালা যুদ্ধ।

সাধারণভাবে বললে জারিগান শোকগাথা। মহরমের দিন থেকে শুরু করে চল্লিশ দিন ধরে এই গান অনুষ্ঠিত হয়। চল্লিশ দিনে 'আখড়া' (লাঠিখেলা ইত্যাদি) বের হয়ে থাকে। এই চল্লিশদিন জারিগানের শিল্পীরা তেল, হলুদ খান না, চুল আঁচড়ান না এবং নিরামিষ আহার গ্রহণ করে থাকেন।

জারিগানের সংজ্ঞা নিরূপণ দুরূহ। এই গানের অর্থ, গুরুত্ব এক এক জনের কাছে এক এক রকম। 'শিয়া' সম্প্রদায়ের লোকরা বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু করে জারি গান দিয়ে। এতে মহিলারা হাসান-হোসেনকে স্মরণ করে বুক চাপড়িয়ে গান পরিবেশন করেন। এটিকে বলা হয় 'হাত মাতম'। কোন কোন জারি গানের শিল্পীর মতে এই জারিগান শুধু কারবালা যুদ্ধ নিয়ে লেখা নয়। এগুলিতে নবীদের জীবনের কথার পাশাপাশি ভালোবাসার গান, হাসির গান ইত্যাদিও গাওয়া হয়। তাছাড়া কোন কোন গবেষকের মতে কারবালা কাহিনির যে কোনো উপকাহিনি নিয়ে পয়ারের ছন্দে লোককবিরা যে গান রচনা করেন তা-ই জারিগান। গুরুসদয় দত্তর মতে,— ''জারি গানের সুরের সঙ্গে সারি বা ভাটিয়ালি সুরের কোথাও মিল খোঁজে পাওয়া যায়। নৌকা চালকদের সারি বা ভাটিয়ালি গান মুসলিম কাহিনিভিত্তিক জারিগানে রূপান্তরিত হয়েছে।'' [৩] বঙ্গীয় 'লোকসংস্কৃতি কোষ' গ্রন্থে রীতা সাহা বলেন,— ''জারী গান মূলত মুসলমান সম্প্রদায়ের গান। বাংলার সব মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলেই এই গানের প্রচলন আছে। প্রধানত এই গান পুরুষেরাই গায়, এই গানের মধ্যে পুরুষের দৃপ্ততা লক্ষ্য করা যায়। .... বাংলার লোকসংগীতের অন্যসব বিষয় থেকে এই বিষয়টি যেন একটু স্বতন্ত্র আসন করে নিয়েছে।'' [৪] গবেষক স্বপন মিত্র বলেন— ''কারবালার যুদ্ধ নিয়ে দীর্ঘ কাহিনীমূলক গানকেই জারিগান বলে।'' [৫]

তাই সার্বিক বিচারে বলা যায়, জারি গানের সরল সংজ্ঞা হয় না। এই গানগুলো প্রথমদিকে ছিল মহরমের গান যেখানে কারবালা যুদ্ধের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনি ও ইমাম পরিবারের মর্মান্তিক বেদনার কাহিনি স্থান পেয়েছে। পরবর্তীতে ধর্মগুরুদের প্রভাবে বিবিধ অনুশাসন জারী করে কারবালা যুদ্ধের চরিত্রগুলোর সদর্থক দিক উপস্থাপন করে বিভিন্ন পুরুষ ও নারী চরিত্রকেন্দ্রিক নতুন স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের দিক যে গানগুলোতে স্থান পেয়েছে সেগুলিই জারিগান। কারবালা যুদ্ধ ও চরিত্র প্রসঙ্গই এই গানের মূল উপাদান। জারিগানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Marry Frances Dunhan বলেছেন —

"Jari songs respresent an important category Bengali epic songs that feature stories from Islamic history and legend, composed in a traditional couplet-verse form and perform by a chief singer ..." [৬]

।। তিন ।।

গোড়ার দিকে জারি গান স্বল্প সময় পরিসরে ছোটো করে গাওয়া হতো। পরবর্তীতে জারিগানকে কেন্দ্র করে কবিগান রচনা শুরু হয়। এধরনের কবিগানে দু'জন কবিয়াল দুটি দলে বিভক্ত হয়ে জারিগান পরিবেশন করতেন। অনেকটা কবিগানের পরিবেশনার লড়াইয়ের মতো হতো এর উপস্থাপনা। প্রতিটি দলে একজন মূল গায়ক (বয়াতি) থাকতেন। সঙ্গে দু'-তিনজন দোহার ও চার-পাঁচজন বাদকের সাহায্যে তাঁরা গীত পরিবেশন করতেন। বেহালা, দোতারা, সারিন্দা, ঢোলক, ডুগডুগি, একতারা, বাঁশি, খঞ্জনি, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র জারি গানের সঙ্গে বাজানো হয়। দুই জারিওয়ালা দলের মধ্যে প্রশ্নোত্তরমূলক নানা গান হয়ে থাকে। এই গানগুলোকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। সেগুলো হলো— বন্দনা, গোষ্ঠগান ও মূল জারি গান। জারি গানে পুরুষ-মহিলা, গুরু-শিষ্য, গণতন্ত্র-রাজতন্ত্র, সুফি-মোল্লা, শরিয়ত-মারিফত ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়। গান ও প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি দলের শিল্পীরা নৃত্য-সংলাপের মাধ্যমে বিচিত্র বিষয়কে উপস্থাপন করেন বলে এটি বাংলা লোকনাট্যের ও মর্যাদা পেয়েছে। জারি নৃত্যগীত সাধারণত সমতলে বৃত্তাকার মঞ্চে সাদা ধূতি বা পাজামার সাথে সাদা গেঞ্জি পরে একজন গায়েন, সহযোগী গায়েন, একদল নৃত্যকার ও দোহারের মাধ্যমে পরিবেশন করেন। এসব নৃত্যগীত পরিবেশনের সময় দোহার - নৃত্যকারগণ হাতে লাল রুমাল বা গামছা ব্যবহার করেন। কিশোর ও যুবক নৃত্যকারগণ তালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কখনো পরস্পর সংবদ্ধ, কোমরে হাত দিয়ে বৃত্ত, রেখা ও সর্পিল গতিভঙ্গ সৃজন করেন। জারিগানে শূন্যে লম্ফদানের কৌশলভঙ্গী পৌরুষের পরিচয়বাহী। কালের যাত্রায় জারি গানের আঙ্গিক ও সুরেও নানা বিষয় স্থান পেয়েছে। বিষয়ের সীমাবদ্ধতা গানের মূল

বৈশিষ্ট্য হলেও কোন কোন অঞ্চলে এর বিষয়বৈচিত্র্য রয়েছে। মক্কার জন্মকথা, জহরনামা, সাদ্দাদের জারি, শাহজালালের জারি, সোহরাব-রোস্তমের জারি ইত্যাদির পাশাপাশি এক সময় সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ব্যঙ্গরসাত্মক বিষয়, পরিবার-পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ক জারিগান বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

।। চার ।।

জারিগানের শ্রেণিবিভাগ নিয়ে মতান্তর রয়েছে। বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য গ্রন্থে জারিকে দশটিভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হলো - জারিগান, মর্শিয়া জারি, মাতম জারি, নাড়া জারি, ঢালী জারি, জল জারি, ব্যাঙ জারি, রচনার জারি, জারি যাত্রা এবং ধুয়াগান। মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী জারিগানকে আটটি ভাগে বিভক্ত করেছেন— মর্শিয়া জারি, মাতম জারি, নাড়া জারি, চালা জারি, জর জারি, ব্যাঙ জারি, রচনার জারি ও জারি যাত্রা।[৭] জারির রূপগত দিককে বিচার করে বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ্ শক্তিনাথ ঝা জারিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি 'জারিগান', অন্যটি 'জারি গজল'। সর্বজনবিদিত মতামত অনুযায়ী জারিগানের বিভাগ সাতটি।

মর্শিয়া জারি ।
ধুয়ো জারি ।
গজল বা কাউয়ালি জারি ।
মাতম জারি।
জারি যাত্রা বা জারি নাটক।
আধুনিক জারি ।
নৌহা।

'মর্শিয়া' জারিগান দিল্লী থেকে বাংলাদেশে আসে। এই গান মূলত উর্দুভাষায় রচিত। এর বিষয়বস্তু কারবালার কাহিনি। আনিস ও দোবির নামক মধ্যপ্রাচের গাথা কবিরাই মর্শিয়া গানের প্রবর্তক ছিলেন। মর্শিয়া গান আকারে ছোট এবং বিলম্বিত লয়ে করুণ সুরে গাওয়া হয়।

'ধুয়োজারি' গানে এক বা দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে মূল গায়েনের গানের বিষয়ের সঙ্গে ধুয়া দিয়ে সহ গায়কেরা গান গেয়ে থাকেন। কোরাণের বাণী ও ইসলামের ধর্মতত্ত্বের কথাই ধুয়ো জারি গানের মূল বিষয়। এই গানে মূল গায়েন ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নৃত্যও করেন।

'কাউয়ালি জারি' গানে হজরত মহম্মদের জীবনী, ধর্মীয় কাহিনির বিষয়কে কেন্দ্র করে

গাওয়া হয়ে থাকে। এধরনের গান সুফিতত্ত্ব ও মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনের প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দি ও বাংলা ভাষার এই গানগুলি রচিত।

'মাতম জারি'। 'মাতম' শব্দের অর্থ শোক। তবে, মাতম জারির গানে বীররসাত্মক ও করুণরসাত্মক উভয় গানই পরিবেশন করা হয়। কারবালা কাহিনি নিয়ে রচিত বীররসের গানে দর্শক যেমন তেজে উদ্দীপ্ত হন ঠিক তেমনি করুণরসের আবহে তাঁরা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

'জারি যাত্রা বা জারি নাটক' কৃষ্ণের যাত্রা জাতীয় পালা গানের অনুকরণে উনবিংশ শতাব্দিতে রচিত হয়। এ ধরনের যাত্রা ও নাটকে যদিও নানা চরিত্র থাকে তবুও ধর্মভাব ও গানের অবিরাম বর্ণনাই অধিক থাকে। জারি যাত্রার মধ্যে থাকা কথা বা সংলাপকে গীতি সংলাপ বলে ধরা হয়।

'আধুনিক জারি' গানে সামাজিক নানা প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক আন্দোলন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ইত্যাদি বিষয় স্থান পায়। বর্তমানে আধুনিক জারি গানের জনপ্রিয়তা খুবই বেশি। 'সাক্ষরতা' নিয়ে লেখা একটি আধুনিক জারি গান এরকম—

শত শত প্রণিপাত লইবেন আমার
ভূমের রাজস্ব ধনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
কমরেড বিনয় চৌধুরী জানাই নমস্কার
রামকৃষ্ণ নারায়ণ বড়ই পুণ্যবান।
ভারত কৃষক সকলের প্রধান
রেণুপদ দাস আহ্বায়ক মহাশয়
নদীয়ার মাঝে বামফ্রন্ট কয়
ভাবিলেন মনে মনে মহোদয়গণ
অশিক্ষিত নিরক্ষর আছে বহুজন
আদেশ দিয়েছে সরকার গ্রাম অঞ্চলে
গ্রামে গ্রামে আছে মেয়েছেলে।
২০ জন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষিত দুই জন
পাড়ায় পাড়ায় পাঠশালা খুলিবে এখন
৯ হতে বয়স ৫০ বছর
নিরক্ষর দূর হবে খুলিবে নয়ন।[৮]

'নৌহা' মানে শোক গাথা। এগুলোতে কোরাণের শ্লোক নিয়ে নানা ধর্মীয় যুক্তি বিশ্লেষণের পাশাপাশি ইমাম হোসেনের উপর নির্যাতনের বর্ণনা থাকে। মহরমের প্রথম দু-তিন দিন এই নৌহা গাওয়া হয়ে থাকে। নৌহাগুলো প্রায় সবই ইমাম হোসেন কেন্দ্রিক।

নৌহার সঙ্গীত গাওয়ার জন্য গায়ককে কোরাণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কয়েকটি নৌহা গীত নিম্নে তুলে ধরা হল —

(ক)

রাতের ওহে কোন পৃথিবীতে আমি অতিথি রয়েছি
সবগল হতে হত্যা হয়ে যাব এটাই ঠিক আলবিদা

(খ)

সহ্য কর ওহে বোন কখনই অভিশাপ দিও না
বদ্ধ ভূমিতে যদি তোমার চাদর কেড়ে নেয় আলবিদা

(গ)

সমস্ত হারম কে এবং বাচ্চাদের তোমায় সঁপে দিলাম বোন
এবং তোমায় খোদাকে সঁপে দিলাম আলবিদা

(ঘ)

দিনদার লোকে আমার পরে তাঁবু জ্বালিয়ে লুটবে
এবং তোমায় রাস্তায় রাস্তায় ফিরাবে মাথা খোলা অবস্থায় আলবিদা।

।। পাঁচ ।।

বাংলা লোকসঙ্গীতের বিপুল ভুবনে জারি গান স্ব-মহিমায় অধিষ্ঠিত। এগুলোর প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন রূপের। উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব জারি গানের সঙ্গে যুক্ত থাকে। সঙ্গীত পরিবেশনের ধরনও এগুলোর আলাদা। নৌহা পরিবেশন জারি গানের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য লোক সঙ্গীতে যেরকম বেদনা বা নৈরাশ্যের সুর স্পষ্ট, ঠিক তেমনি জারি গানে শোকার্ত বিলাপের প্রসঙ্গ আছে। তবে বাংলা লোকসঙ্গীতের ধারায় জারির গানেই প্রথম শৌর্য-বীর্যের প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। এই গানগুলো দুঃখের সুরেই বেশি গাওয়া হয়ে থাকে। এগুলো কারবালার যুদ্ধ বৃত্তান্তকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা বীর এবং করুণ রস-ঘন উপাখ্যান। আঞ্চলিক ভাষা ছাড়াও অসংলগ্ন অমার্জিত ভাষা এবং আরবি-পার্শি শব্দের বহুল ব্যবহার এধরনের গানে দৃষ্টিগোচর হয়। উচ্চারণের বিকৃতিও এগানে শোনা যায়। এ ধরনের গানের অধিকাংশ শ্রোতা গ্রামের নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত লোকজন। জারি গানের বিশিষ্ট সুর হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের শ্রোতার হৃদয়কে উৎসুক করে তোলে।

কারবালার কাহিনি নিয়ে শুধু লোকসঙ্গীতের ধারা সমৃদ্ধ হয়নি। কারবালা কাহিনির অতীত ইতিহাস, দুঃখ জনক হত্যালীলা, শোচনীয় পরিণতি ইত্যাদি কেন্দ্রিক রচনাগুলো বাংলা সাহিত্য ভান্ডার সমৃদ্ধ করেছে। সেগুলোর কয়েকটি হলো—

গদ্য সাহিত্য

মীর মশারফ হোসেন রচিত 'বিষাদ সিন্ধু'।
ফজলুর রহমান চৌধুরীর লেখা 'মহরম চিত্র'।

কাব্য সাহিত্য

- মহম্মদ হামিদ আলি — কাশেম বধ ও জয়নাল উদ্ধার।
- আব্দুল মুনায়েম — পঞ্চ শহীদ
- মতিউর রহমান — এজিদ বধ ও মোসলেম বধ
- আব্দুল বারি — কারবালা
- সৈয়দ ইসমাইল হুসেন সিয়াজি — মহাশিক্ষা
- মহম্মদ ইব্রাহিম — শহীদের খুন।
- আজিজুল হাকিম — মরুসেনা।
- মীর রহমত আলি — মহরম কাব্য।
- দামসের আলি তালুকদার — হাসানবধ।
- কবি মুখী মহম্মদ মহছেন উন্না — বাঙালা মর্ছিয়া।
- মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান — মাতমে কারবালা ও কারবালার মাতম জারি।
- হেয়াত মামুদ — জারী জঙ্গ নামা।
- শেখ দোস্ত মোহম্মদ — জঙ্গনামা।
- জসীম উদ্দীন — জারীগান।

।। ছয়।।

বঙ্গদেশে বিভিন্ন পদকর্তার দ্বারা অসংখ্য জারি গান রচিত হয়েছে। এর মধ্যে থেকে কয়েকটি প্রচলিত জারি গান তুলে ধরা হল —

বন্দনার গীত

হায় হোছেন!
পূবেতে বন্দনা করি পুবের ভানুশ্বর।
একদিকে উদয়গো বানু চৌদিগে পশর।
দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীন্নদী সাগর।
যেখানে বাইতো ডিঙা চান্দ সদাগর।
উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত।

যেখানে রাইখাছেন আলী মাল্লামের পাথর।
পশ্চিমে বন্দনা করি মক্কা হেন স্থান।
উদ্দিশে জানায় গো ছেলাম মমিন মুছলমান।
ইহার পশ্চিমের কথা কহনও না যায়।
আড়িয়ে রান্ধিলে ভাত বরান্ধণে খায়।[৯]

মর্শিয়া জারি

শহর বানু কেঁদে বলে
হায়রে আল্লা হয়রে হায়।
এ দুনিয়া আঁধার করে
ঐ যে ও কে রণে যায়।
মোমেনগণ যে রণে গিয়া
ফিরে কেহ এল না।
ঐ রণে হে প্রাণনাথ
তোমায় যেতে দিব না।
ইজ্জত আবরু আমার
তোমার হাতে দিয়েছি।
তোমারই লাগিয়া আজো
এ পরাণ রেখেছি।
আজিএ ইজ্জত তোমার
কার হাতে সঁপিয়া যাও।
কোথা যাব আমরা সবে
ফিরে আসি বলে দাও।
ফেরো এমাম চাইনে পানি
তোমায় দেখে প্রাণ জুড়াই।
তুমি বিনে ত্রিভুবনে
অভাগিনীর কেহ নাই।[১০]

মাতম জারি

হায় হায় হাসেন হায় হায় হাসেন
কাশেম, আকবর হয় আসগার।

পানি বিনে মরে রণে দিল কলেজা ফতেমার।
আহলিয়াতে নিয়ে সাথে ছেড়ে শাহা মদিনা।
কুথায় যাবার তরে হইলেন রওয়ানা।
রাহা ভুলে সকলে মিলে পৌঁছিলেন কারবালা।
কাতেলের আলামত দেখে হোসেন উতলা।
দাবিল ঘোড়ার পাও কারবালার এ জমিনে।
হায় হায় শোনা যায় ঐ চারিদিকেতে
তামাম দরক্ত হোতে ঝড়ে পড়ে কাঁচা খুন।
চারিধারে আছে ঘিরে গমামেরি দুষমণ।
দেখে শাহা করে ইহা তামাম আহলিয়াতে।
ফোরাত ভরিয়া যাবে সহিদের ঐ লহুতে
চুলু পানি বিনে যাবে কলেজে ফাটিয়া।
জুলুসের তেগ হাতে শের নিবে কাটিয়া।
সবুরে ডুরী ধর দেখ খোদার কি করে।
ভেজ হো শোকরাণা চল নবীজির ঐ দিদারে ।
উড়াও নিশান, গাঢ় ঝাণ্ডা বাজাও ভেরী, দামামা।
মার তেগ বিদেরেগ দিওয়া কেও আম্মানা ।

সূত্রনির্দেশ :

১। নদীয়া কাহিনী, মোহিত রায় (সম্পা), পুস্তকবিপণী, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃ. ৩৪৯।
২। Mohiuddin Ahmed, Jarigan (Muslim Eplic Songs of Bangladesh) Chapter-2, United Prem Ltd. Dhaka, ১৯৯৭. পৃ.২৯
৩। পুলকেন্দু সিংহ, জারগান প্রসঙ্গে, ঈক্ষণ বইমেলা সংখ্যা, জানুয়ারী-২০০১, বাগুইহাটি, কলকাতা।
৬। ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পা.), বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ, অর্পণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, পৃ. ১৪২-১৪৩
৭। মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, লোকসঙ্গীত, প্যাপিরাস, ঢাকা, ১৩৯৯, পৃ. ১৫।
৮। পুলকেন্দু সিংহ, প্রাগুক্ত।
৯। আশরাফ সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য (২য় খণ্ড) গতিধারা, ঢাকা ২০০৮, পৃ. ১১৫।
১০। পুলকেন্দু সিংহ, প্রাগুক্ত।
১১। পুলকেন্দু সিংহ, প্রাগুক্ত।

বাংলা যাত্রার উদ্ভব ও বিবর্তন

।। এক।।

বাংলা অভিনয় শিল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ ধারা 'যাত্রা'। এর সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে লোকজীবনের প্রাণের সম্পর্ক। মূলত 'যাত্রা' লোকনাট্যের ধারা হলেও সময়ের পালাবদলের মধ্যদিয়ে এটি আজ পরিশীলিত পর্যায়ে নিজের পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। বিচিত্র উন্নত প্রযুক্তি মাধ্যমকে সাঙ্গীকরণ করে, ধর্মাশ্রয়ী ও লোকভাষাকে বর্জন করে যাত্রা আধুনিক কালে এক নাগরিক রূপ লাভ করেছে।

দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে প্রাচীনকালে আমাদের দেশে ধর্মপ্রাণ মানুষ নৃত্য-গীতের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে শোভাযাত্রার দ্বারা ধর্মপ্রচার করতো। নৃত্য-গীতযোগে এই শোভাযাত্রায় দেবতাদের নানা মাহাত্ম্যমূলক কীর্তন গাওয়া হতো। যার আনুষ্ঠানিক নাম 'জঙ্গম উৎসব'[১]। এই 'জঙ্গম উৎসব'-কেই প্রাচীন কালে বলা হত 'যাত্রা'। গমনার্থক 'যা' ধাতু থেকে এই শব্দটির উৎপত্তি। যা + ত্র (ভাবে) + আ (স্ত্রী) = যাত্রা। এ প্রসঙ্গে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য জানান,— ''প্রাচীনকালে ... এই জঙ্গম উৎসবকে বলিত যাত্রা। বস্তুত যাত্রা শব্দটি গত্যর্থক। গমনার্থক 'যা' ধাতু হইতে ইহার উৎপত্তি। ক্রমে ঐ দেবলীলায় গমন ব্যাপার এতই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে লোকে সাধারণে প্রদর্শনাভিলাষী না হইয়া একস্থানে বসিয়াই তদ্ব্যাপার প্রকটন করিল।''[২] এতে পরিক্রমা বন্ধ হলেও এই ধর্মানুষ্ঠান যাত্রা নামেই খ্যাত থাকল। পরবর্তীকালে এই রূপ ধর্মোৎসবের নৃত্য-গীতানুষ্ঠানের সঙ্গে অভিনয়ের উপাদান সংযোজিত হওয়ার মাধ্যমে যাত্রাপালার উদ্ভব হয়।

ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ দেবদেবী চরিত্রের অলৌকিক ঘটনা পরম্পরা স্মরণ রাখার জন্য এক একটি উৎসব অনুষ্ঠান করে থাকেন। গীত-বাদ্যাদিযোগে ঐ সকল লীলোৎসব প্রসঙ্গে যে অভিনয় প্রদর্শিত হয়ে থাকে তাই প্রকৃত যাত্রা বলে অভিহিত। আবার 'যাত' বাংলাদেশের লৌকিক এক দেবতা। যার অর্থ গমন। 'যাত' শব্দের পরিবর্তন রূপ থেকেও 'যাত্রা' হওয়ার সম্ভাবনার প্রসঙ্গও 'বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা' গ্রন্থে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন। কোন কোন গবেষক আবার সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন গমন উপলক্ষে

কৃষিজীবী সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত নৃত্য-গীতযুক্ত 'সূর্য্য-যাত্রা-উৎসব' থেকে 'যাত্রা' শব্দটি সমাজে প্রবর্তিত হয়েছে বলে মত পোষণ করেন। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে,— "যাত্রা বা উৎসব উপলক্ষ্যে নাট্যগীতের অনুষ্ঠান হইত বলিয়া ক্রমে নাট্যগীতকেই যাত্রা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।" [৩]

নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষে 'যাত্রা' সম্বন্ধে বলা হয়েছে— "শ্রীকৃষ্ণের রাসচক্র গমনরূপ ব্যাপার রাসযাত্রা নামে প্রসিদ্ধ। দোলযাত্রা, রথযাত্রা, গোষ্ঠযাত্রা প্রভৃতি দেবলীলার ঘটনাগুলি স্মৃতিপথে সমরূপ রাখিবার জন্য কতকগুলি লোকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এক এক স্থানে সমাগমপূর্বক ব্যক্তি সাধারণের নিকট তদ্ব্যাপার প্রদর্শণার্থ একটি ধারাবাহিক চরিত্র চিত্র সমুপস্থিত করে। এই ব্যাপারই ক্রমে উৎসব বা যাত্রা নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। যে দেব চরিত্রাংশ অতি গভীর পূজা আড়ম্বর ও ভক্তিসহ আনন্দ তরঙ্গে নাচগান বিমিশ্রিত হইয়া লোকসমাজে প্রকটিত হয়, তাহাই যাত্রা।" [৪] সংস্কৃত বিশ্বকোষে বলা হয়েছে— "যাত্রাতূ যাপনোপয়েগতৌ দেবর্চনোৎসবে"। —তাই দেবার্চনা থেকেই যে যাত্রার উদ্ভব হয়েছে তা অনুমান করা ভুল হবে না। সম্রাট অশোকের (অষ্টম শতক) শিলালিপিতে উৎসব অর্থে 'যাত্রা' শব্দের ব্যবহারের তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়।

।। দুই ।।

যাত্রার প্রচলন ভারতের ইতিহাসে সুপ্রাচীন। কখনো দেবী ভগবতীর উদ্দেশ্যে মাসিক যাত্রা, আবার কখনো বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দ্বাদশ প্রকার মুক্তি প্রদায়িনী যাত্রার উল্লেখ 'বামকেশ্বরতন্ত্র' ও ষোড়শ শতকের রঘুনন্দনবিরচিত 'যাত্রাতত্ত্বম্' গ্রন্থে আছে। দ্বাদশ প্রকার সেই যাত্রাগুলি হলো— বৈশাখে চন্দনী, জ্যৈষ্ঠে স্নাপনী, আষাঢ়ে রথ, শ্রাবণে শয়নী, ভাদ্রে দক্ষিণ পার্শ্বিরা, আশ্বিনে বামপর্শ্বিকা, কার্তিকে উত্থানী, অগ্রহায়ণে ছাদনী, পৌষে পুষ্যাভিষেক, মাঘে শাল্যোদনী, ফাল্গুনে দোল ও চৈত্রে মদনভঞ্জিকা।[৫] উৎসব বা যাত্রা উপলক্ষে অভিনয়ের জন্য সেসময় নাট্যরচনারীতির নানা পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন— কালপ্রিয়নাথের যাত্রা উপলক্ষে ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' ও 'মালতীমাধব', 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'রত্নাবলী' ইত্যাদি। তাছাড়া, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর দ্বারা ও নানাবিধ নাট্য রচনারীতি সৃষ্টি হয়েছিল। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' গ্রন্থের কাহ্নপাদের পদ "তোহারে অন্তর ছাড়ি নড়পেড়া" পাঁচ এবং বাণীপাদের সতেরো সংখ্যক পদ—

নাচন্তি কহিল গান্তী দেবী
বুদ্ধ-নাটক বিসমা হোই।"[৬]

মনে হয় সে-সময়ের নাট্যরীতিই পরিবর্তিত হয় যাত্রাভিনয়ে। খ্রিঃ দ্বাদশ শতকে রচিত 'গীতগোবিন্দ'কেই পণ্ডিতগণ যাত্রার আদিরূপ বলে মত ব্যক্ত করেন। ড. হংস নারায়ণ

ভট্টাচার্যের মতে— "জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্ (খৃ ১২শ শতাব্দী) এ বাংলার যাত্রাগানের আদিম রূপটি বিধৃত আছে বলে মনে হয়।"[৭] আবার অনেকে গীতগোবিন্দের ভেতরে পুতুল নাচের উপকরণ লক্ষ করেছেন। ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গীতগোবিন্দকে পাঁচালি কাব্য বলতে চেয়েছেন। তিনি এর সঙ্গে মধ্যযুগের পাঁচালির সাদৃশের কথা বলেছেন— "গীতগোবিন্দ মূলত কাব্য, তবে এর আকার প্রকার নাট্যগীত বা যাত্রাগানের চেয়ে আবৃত্তি— গীতাত্মক পাঁচালীর অধিকতর নিকটবর্তী।"[৮] ড. অজিত কুমার ঘোষ গীতগোবিন্দের ভেতরে বাংলার প্রাচীন যাত্রাভিনয়ের নিদর্শন লক্ষ করে বলেছেন— "বাংলার প্রাচীন যাত্রাভিনয়কে গীতিনাট বা নাটগীত বলা হতো। জয়দেবের গীতগোবিন্দ সংস্কৃতে রচিত হলেও এর মধ্যে বাংলাদেশে প্রচলিত গীতিনাটের নিদর্শন পাওয়া যায়। স্বয়ং কবি এখানে অধিকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।"[৯] বিভিন্ন পণ্ডিতবর্গের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে যাত্রাগানের বিকাশের ক্ষেত্রে জয়দেবের গীতগোবিন্দের যে বিশেষ প্রভাব রয়েছে তা স্পষ্টত বোঝা যায়।

মধ্যযুগের আদিতম নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য' যাত্রাগানের প্রাথমিক পর্যায় বলে মনে করার অসংখ্য যুক্তি আছে। কাব্যটিতে উক্তি-প্রত্যুক্তি সংলাপপূর্ণ বিভিন্নগানের সাহায্যে নাটকীয়তা ফুটে উঠেছে। ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যটির মধ্যে ঝুমুরের আভাস লক্ষ করেছেন। ড. সুকুমার সেন এটিকে 'গীতিসর্বস্বনাট্যকাব্য', 'গীতিনাট্য কাব্য', 'নাট্যগীতি' নামে অভিহিত করেছেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে গীতিনাট্যের রূপ লক্ষ করে ড. অজিত কুমার ঘোষ বলেন,— "গীতিনাট্যের পূর্ণতর নাট্যরূপ দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে একটি কৌতুহলোদ্দীপক ও সুসংবদ্ধ কাহিনী রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি চরিত্র কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই নাটকের মতো উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপ উচ্চারণ করেছে। নাট্যোৎকণ্ঠা, পরিস্থিতির বৈপরীত্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নাট্যাবেগের সৃষ্টি হয়েছে।"[১০]

বঙ্গদেশের সমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্য। তাঁর প্রভাবেই বাংলার সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির ভিত পোক্ত হয়। চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই গৌড়ে বৈষ্ণবাশ্রয়ী ভক্তিধর্মের সূচনা। মালাধরবসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা ও মাধবেন্দ্রপুরীর ভাগবতাশ্রয়ী 'কৃষ্ণলীলা' যাত্রার প্রচার-ইতিহাস ও চৈতন্য পূর্ববর্তীযুগের। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর থেকে বঙ্গদেশে 'কৃষ্ণযাত্রা' কেন্দ্রিক নৃত্যগীতানুষ্ঠান নতুন যাত্রা পায়। 'কৃষ্ণলীলাশ্রয়ী' নাটকে চরিত্রানুযায়ী সাজসজ্জাসহ আসরে অভিনয়ের রীতি প্রথম সংযোজিত হয় চৈতন্যদেবের হাত ধরেই। তাঁর নাট্যচর্চার প্রমাণ আছে বৃন্দাবন দাস, মুরারি গুপ্ত প্রমুখ চৈতন্য জীবনচরিতকারদের লেখা রচনাগুলিতে। তিনি খোলামঞ্চে যাত্রার মতো নানা পালায় অভিনয় করেছিলেন। অভিনয়কে তিনি জনসাধারণের

মধ্যে ধর্মভাব প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। কারণ, ''নাট্যাভিনয় শুধু সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ নয়, এটি লোকশিক্ষারও একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এই মাধ্যমটির উপযোগিতা মহাপ্রভু ভাল করেই উপলব্ধি করেছিলেন।''[১১] নদীয়া ও নীলাচলে শ্রীচৈতন্য 'রুক্মিণীহরণ', 'ব্রজলীলা' ও রাবণবধ পালা অভিনয় করেন। তাঁর অভিনীত পালা যাত্রা খোলা জায়গায়, গান, নৃত্য সংলাপের সংমিশ্রণে, সাজসজ্জা করে, দোহার ইত্যাদির সহযোগে উপস্থাপিত হত। তাঁর প্রভাবে পরবর্তীতে 'কৃষ্ণযাত্রা'র এক বিশেষ রীতি গড়ে ওঠে; যে রীতির নাম দেওয়া হয় 'চৈতন্যযাত্রা' এবং রায় রামানন্দ, রূপগোস্বামী প্রমুখরা সেসময় অনেক যাত্রা পালাও লিখেছেন। ধর্মীয় বিষয়বস্তুই ছিল এই সব যাত্রাপালার মূল অবলম্বন। যাত্রার অধিকারীরা তখন মূলত 'ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়' এই নীতিই প্রচার করতেন।

ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের প্রযোজনায় কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নানা অভিনয় হত। তিনি অভিনয়ে সকলের ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দিতেন। যাত্রাদলের অধিকারীর মতো তাঁর নির্দেশে অভিনেতারা নানা চরিত্র অনুযায়ী সাজগোজ করতেন। 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' রূপে খ্যাত বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় একটি যাত্রাপালা অভিনয়ের চরিত্রলিপি খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। পালার নাম 'রুক্মিণী স্বয়ংবর'। ভাগবতের দশম স্কন্দের (৫৩-৫৪ অধ্যায়) আখ্যান অবলম্বনে রচিত উক্ত পালায় যাঁরা যে চরিত্রে অভিনয় করেছেন এর তালিকাটি নিম্নরূপ—

অদ্বৈত আচার্য	-	বিদূষক
গৌরাঙ্গদেব	-	রুক্মিণী ও আদ্যশক্তি
হরিদাস	-	কোটাল
শ্রীবাস	-	নারদ
রামাইপন্ডিত	-	নারদ শিষ্য
গদাধর	-	রাধা
ব্রহ্মানন্দ	-	রাধার বড়াই
মুরারি গুপ্ত	-	কোটালের সঙ্গী

আসরে অভিনয়ের জন্য গৌরাঙ্গদেবের সুনির্দিষ্ট চরিত্রে নির্দিষ্ট অভিনেতা নিয়োগের এই যে পরিকল্পনা তা পরবর্তীকালের যাত্রাভিনয়ের রূপরীতির অনুরূপ। এই চরিত্র সজ্জা এবং অভিনেতাদের বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান লক্ষ করে অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— ''এটি আসরী অভিনয় অর্থাৎ যাত্রাভিনয়। কারণ রঙ্গমঞ্চের বা দৃশ্যসজ্জার কোনও উল্লেখ 'চৈতন্যভাগবতে' পাওয়া যায় না।''[১২] মহাপ্রভুর অভিনয় লীলা আধুনিক যাত্রাগানের প্রাথমিক পর্যায় বলে মনে করেন যাত্রা বিশেষজ্ঞ ড. হংসনারায়ণ

ভট্টাচার্য। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন— ''আধুনিক যাত্রাগানের সঙ্গে মহাপ্রভুর এই অভিনয় লীলার সম্পর্ক কতখানি তা বলা সহজ নয়। তবে মহাপ্রভুর এই অভিনয় লীলা যে যাত্রাগানেরই প্রাথমিক পর্যায় তাতে সন্দেহ নেই। ষোড়শ শতকের পরে যাত্রাগান সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না। আধুনিক যাত্রাগানের আবির্ভাব কাল খৃষ্টিয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ।''[১৩]

।। তিন ।।

বাংলা যাত্রাপালার বিবর্তনের ইতিহাসে দুটি ধারা প্রবহমান। একটি হলো প্রাচীন ধারা, যা ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের প্রভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং অন্যটি হলো আধুনিক ধারা, যার বিকশিত রূপ ঊনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়েছিল। এ সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী বলেছেন ''যাত্রা অভিনয় প্রসংগে দুটি শতাব্দীর কথা আমাদের মনে রাখতে হবে— ষোড়শ আর ঊনবিংশ। যাত্রার বীজ ও পত্তন হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালীর মাটিতে। অংকুর দেখা গেল ঊনবিংশ শতকে।''[১৪] চৈতন্যদেবের পর থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাটযাত্রার বিশেষ কোন নমুনা পাওয়া যায় না। নাটগীত ও যাত্রাগান বাংলাদেশে প্রসার লাভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। পাঁচালি, কবিগান ও কীর্তনেরই সেসময় চল ছিল। কিন্তু ভারতচন্দ্র রায় বিরচিত হাস্যরস ও কৌতুকরসের যাত্রাপালামূলক কাব্য 'বিদ্যাসুন্দর'কে সেসময়ের রুচিসম্পন্ন দর্শককূল সাদরে গ্রহণ করেছিল। অষ্টাদশ শতকেই চৈতন্যদেবের প্রভাবে প্রাদুর্ভাব ঘটল 'নামযাত্রা' 'শক্তিযাত্রা', 'পালাযাত্রা', 'চৈতন্যযাত্রা' প্রভৃতি। এরমধ্যে জনপ্রিয় 'কৃষ্ণযাত্রা'র পাশাপাশি একপ্রকার মিশ্র প্রকৃতির (যেমন— কালীয়দমন, মানভঞ্জন, কলঙ্কভঞ্জন, নৌকাবিলাস, নিমাইসন্ন্যাস, প্রভাস, কংসবধ) যাত্রাপালার অভিনয় হতে শুরু হল। তবে অষ্টাদশ শতকের শেষের দশকগুলিতে ধর্মাশ্রিত সমাজে ভাঙন, মানুষের হীন মানসিকতার প্রবৃত্তি, লাম্পট্য, অশ্লীলতা ইত্যাদি যাত্রাপালায় স্থান করে নেওয়ার ফলে এর গৌরবহানি ঘটতে থাকে। এ বিষয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' গ্রন্থে বলেন,— ''গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে কবির হ্রাস পাইয়াছে। তাহার ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব হইতে যাত্রা বিশেষ প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। শিশুরাম অধিকারী নামে এক ব্যক্তি কেঁদুলী গ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার গৌরব সম্পাদন করে। তৎপূর্ব হইতে বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশ স্বরূপ একপ্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিদিত আছে। সংকীর্তন ও পরে 'কবির' প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায়শ লোপ পাইয়াছিল। শিশুরাম হইতে তাহার পুনর্বিকাশ হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাস, সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেক যাত্রার পরিবর্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়াছেন।''[১৫]

বাংলা যাত্রার কদর্য সংস্কৃতিকে শিশুরাম অধিকারী নতুনভাবে পুনর্বিকাশের চেষ্টা করলেও তাঁর শিষ্য পরমানন্দ অধিকারী মহাশয়ই ছিলেন যাত্রার সংস্কারের অগ্রদূত। "তিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই বীরভূম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন; ... তিনি 'কালীয়দমন' যাত্রা রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।"[১৬] যাত্রার গানের সঙ্গে সংলাপ সংযোজন তাঁর দ্বারাই প্রথম ঘটেছে বলে জানা যায়। সংলাপের আধিক্য তাঁর সৃষ্ট যাত্রাপালার মূল বৈশিষ্ট্য। শিষ্য পরমানন্দ অধিকারীই সর্বপ্রথম একঘেয়ে বৈষ্ণবগীতির পরিবর্তে যাত্রায় নাট্যিক ক্রিয়া ও সংলাপ সংযোজন করেন। যাত্রায় বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য তিনি 'তুকেকা' প্রথা প্রবর্তন করেন। একটি 'তুকেকা'—

" সারা বন বুলে বুলে
বনফুল আনলাম তুলে
তার বোঁটাগুলি দিলাম ফেলে
তোমার শ্যামাঙ্গে বাজিবে বলে।"

প্রেমচাঁদ অধিকারী নামে পরমানন্দ অধিকারীর সমসাময়িক একজন যাত্রাওয়ালা যাত্রায় প্রথম মহাজনী পদাবলীর সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত বাংলাশব্দ ব্যবহার ও চৌপদী আবৃত্তি শুরু করেন। প্রেমচাঁদের শিষ্য ছিলেন বদন অধিকারী। ভাগীরথী নদীতীরের 'সালিখা' গ্রামের অধিবাসী বদন অধিকারী 'বদন যাত্রা' দলের মাধ্যমে 'দান', 'মান', 'মাথুর' প্রভৃতি পালা অভিনয়ের দ্বারা পাঠকমহলে সমাদৃত হন। তিনি বৈষ্ণব কবিতাকে সহজভাষায় রূপান্তরিত করে যাত্রায় প্রয়োগ করেন। বদন অধিকারীর মৃত্যুর পর 'কালীয় দমন' যাত্রার প্রাচীন রীতির অভিনয় প্রায় শেষ হয়ে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে 'বিদ্যাসুন্দর' এবং 'নল-দময়ন্তী'কে বিষয় হিসেবে নিয়ে 'সখের যাত্রা'-পালার রীতি সৃষ্টি হয়। "সখ করিয়া করিয়াছিলেন এইজন্য লোকে এই দলকে 'সখের দল' বলিত। তাহার পর অন্যলোকে অর্থলোভে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে লাগিল তখনও সেই নাম থাকিয়া গেল।"[১৭] মানবজীবন কাহিনিই ছিল এই যাত্রাপালার মূল আশয়-বিষয়। অশ্লীলতা, ভাঁড়ামি ও নানাধরনের সঙ্-এর জন্য সেইসমস্ত যাত্রাপালার রুচি উন্নত পর্যায়ের ছিল না। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে বরানগরের ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, গোপাল উড়, কৈলাসচন্দ্র বারুই প্রমুখ ব্যক্তিদের দ্বারা যাত্রাপালার পরিবেশনের নানা তথ্য থাকলেও সর্বপ্রথম গোবিন্দ অধিকারীর (১২০৫-১২৭৭ বাংলা) হাত ধরেই বাংলাযাত্রার পরিবর্তন সূচিত হয়। তিনি ছিলেন একাধারে লেখক, স্বত্বাধিকারী, পরিচালক, সংগীতকার, সুরকার ও অভিনেতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য যাত্রা হল— 'শুকসারির পালা', 'চড়া নূপুরের দ্বন্দ্ব' ইত্যাদি। ব্যাখ্যামূলক ঘটকালি প্রথা ত্যাগ করে তিনি যাত্রাকে অভিনয়কলায় পরিণত করেন। সমাজজীবনের চলিত ভাষাকে সংলাপে ব্যবহার, কীর্তনাঙ্গিকের সংগীত সংযোজনের

মাধ্যমে কৃষ্ণযাত্রাকে তিনি জনপ্রিয় করে তোলেন। ঊনবিংশ শতকের প্রায় মধ্যভাগে কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১২১৭-১২৯৪ বাংলা) 'বিদ্যাসুন্দর' সহ অন্যান্য যাত্রাপালাকে ভাঁড়ামি, অশ্লীলতা ও রুচিবিকৃতির পঙ্কিলতা থেকে জনমনচিত্তকে মুক্তি দেওয়ার প্রয়াসে 'কৃষ্ণযাত্রা'য় সৎ ও বিশুদ্ধ ভক্তিরসের সংযোগ ঘটাতে সচেষ্ট হন। তাঁর অন্যান্য পালাগুলি হল— 'রাই উন্মাদিনী' (১৮৪২), 'বিচিত্রবিলাস' (১৮৫৬), 'নিমাই সন্ন্যাস' 'কালীয়দমন', 'গন্ধর্বমিলন' ইত্যাদি। গীতিসংলাপ ও কীর্তনাঙ্গের সংগীতই প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর যাত্রাপালাগুলিতে। গোবিন্দ অধিকারী ও নীলকণ্ঠ অধিকারীর পরবর্তী সময়ে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় 'কালীয়দমন' যাত্রাকে কদর্য সংস্কৃতি থেকে মুক্তি দেবার প্রয়াসী হয়ে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। 'চণ্ডালিনী উদ্ধার', 'কংসবধ', 'মান', 'মাথুর', 'কলঙ্ক ভঞ্জন' ইত্যাদি সাতটি যাত্রাপালা তিনি রচনা করেন। সংলাপ ও গানের সমতা তাঁর যাত্রাপালার বৈশিষ্ট্য। গদ্যসংলাপের ব্যবহার করে পাত্রপাত্রীরা দৃশপট সহ সশরীরে নিজ নিজ ভূমিকায় অভিনয় করত তাঁরা যাত্রাপালাতে।

অন্যদিকে, ইংরেজদের হাতধরে ১৭৫৩ সালে 'প্লে হাউস' রঙ্গালয়, ১৭৯৫ সালে লেভেদেভ কর্তৃক পাশ্চাত্য নাট্যধারার রীতিতে 'বেঙ্গলী থিয়েটার',— 'সখের থিয়েটার'-এর পাশাপাশি ১৮৭২ সালে ন্যাশনেল থিয়েটার নামে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের স্থাপন হয়। ইংরেজদের রঙ্গমঞ্চে প্রভাবিত হয়ে অনেক শিক্ষিত ও রুচিসম্পন্ন বাঙালিরাও পাশ্চাত্য ধাঁচে মঞ্চস্থাপন ও নাট্যাভিনয় শুরু করেন। দর্শকদের দেশীয় যাত্রা রীতি ও লোকনাট্যের উপর আকর্ষণ কমতে থাকে। নতুন যুগ ও দর্শকদের রুচিকে মাথায় রেখে বহমান যাত্রাগানের রূপ-রীতিকে পরিবর্তন ঘটিয়ে তৈরি হয় 'গীতাভিনয়' বা 'অপেরা' যাত্রাগোষ্ঠীর। "কৃষ্ণযাত্রার ও নতুন যাত্রার গীত অংশকে সংক্ষিপ্ত করে তার স্থানে আধুনিক নাটকের অভিনেয় অংশের প্রাধান্য দেওয়া হলো, সেজন্য তার নামকরণ করা হলো 'গীতাভিনয়'।"[১৮] যাত্রার মধ্যে যেখানে কাহিনি শিথিল এবং সংলাপ অপেক্ষা গীতের গুরুত্ব বেশি সেখানে গীত ও সংলাপকে সমগুরুত্ব দেওয়া হল। যাত্রা যেখানে খোলা আসরে অভিনীত হতো, গীতাভিনয় মঞ্চ ও খোলা উভয় স্থানেই অভিনীত হতে লাগলো। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে 'যাত্রাগান'-এর পরিচয় পেলো 'যাত্রাভিনয়' রূপে। এর প্রণেতা মনোমোহন বসু। তাঁর রচনারীতি সম্পর্কে একজন নাট্য সমালোচক বলেন, "— মনোমোহন বসু বুঝিয়াছিলেন যে ইউরোপ আর ভারতবর্ষ এক নহে। তাই জনগণের নাট্যপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি যাত্রাধর্মী একশ্রেণীর নাটক রচনা করেন। গানের সংখ্যা কমাইয়া, পাত্রপাত্রীর গলা অধিকতর স্বাভাবিক করিয়া এবং পালার ভক্তি ও করুণ রসের জোগান দিয়া মনোমোহনের নাটক রচিত হয়।"[১৯] পরবর্তীকালে হুগলী জেলার চন্দননগরের মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় (মদনমাষ্টার) 'প্রহ্লাদ চরিত্র' 'রাম বনবাস',

'মদনভস্ম' ইত্যাদি পালায় অভিনয়ের কলাকৌশল সহ নানা সাজ সরঞ্জামের ব্যবহার করে যাত্রাভিনয়ে বৈচিত্র্য নিয়ে আসেন। পূর্বে অভিনয়কালে অভিনেতা-অভিনেত্রী কর্তৃক ব্যবহৃত তাৎক্ষণিক গদ্য সংলাপের প্রচলন তিনি বন্ধ করে দেন। নাট্যসমালোচকদের মতে তিনি প্রথম যাত্রাভিনয়ে 'জুড়িগান'-এর অবতারণা করেন এবং পেশাদার অভিনেতা-অভিনেত্রী কর্তৃক দর্শকের কাছ থেকে 'পেলা নেওয়া প্রথা' বন্ধ করে দেন। মদনমাষ্টারের অব্যবহিত পরে তাঁর পুত্র নবীন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী কৈলাসবাসিনী দলের হাল ধরেন। তখন যাত্রাভিনয়ের দলটি 'বৌ-মাষ্টার'-এর দল নামে সমাজে পরিচিত হয়। যাত্রাভিনয়ে ব্যবহৃত সুরের পরিমার্জনা করেন বৌ -মাস্টার মহাশয়া।

।। চার।।

আধুনিক যাত্রার জনক মতিলাল রায়। তিনি যাত্রাভিনয়ে যুগান্তর আনেন। ১৮৪৩ সালে বর্ধমান জেলার 'ভাতশালা' গ্রামে তাঁর জন্ম। 'হরিনারায়ণ চৌধুরীর যাত্রাগানের আসর দেখে তিনি এর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এই দলেই অভিনয় শুরু করেন। পরবর্তীতে 'নবদ্বীপ বঙ্গগীতাভিনয় সম্প্রদায়' নামে ১২৮০ বঙ্গাব্দে এক স্বাধীন যাত্রাদল গঠন করেন। তিনি রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণকাহিনি অবলম্বন করে 'রামবিবাহ' 'রামবিদায়' 'হরধুন ভঙ্গ', 'সীতাহরণ' 'কর্ণবধ', 'যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ', 'কালীয়দমন', 'নরকাসুর', 'শ্রীক্ষেত্রমাহাত্ম্য' 'উমাসংবাদ' ইত্যাদির মতো অসংখ্য পালা রচনা ও অভিনয় করেন। তাঁর সবগুলি পালাই ছিল ভক্তিরসাশ্রিত। তিনি যাত্রাভিনয়ের পালাকে লোকশিক্ষার বাহন হিসেবে গ্রহণ করেন। পুরাতন সনাতন-রূপকে তুলে এনে বাঙালি তথা ভারতবাসীকে ধর্মান্ধতা ও ধর্মহীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করাই ছিল তাঁর যাত্রাভিনয়ের মূল উদ্দেশ্য। ''পুরাতন যাত্রাগানের প্রচলিত আদর্শ তিনি অনেকাংশে পরিত্যাগ করেন। যাত্রার পালাকে অঙ্ক-গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করে এবং দীর্ঘ সংলাপ (বক্তৃতা ও কথকতার মতো অতিদীর্ঘ) ব্যবহার করে তিনি যাত্রাগানকে যাত্রাভিনয়ে রূপান্তরিত করেন। নীলকণ্ঠ পর্যন্ত যাত্রায় যে পুরাতন রীতি ছিল তা ত্যাগ করে যাত্রাকে পুরোপুরি নাটকের রূপ দেন।''[২০] বঙ্গদেশের সীমা অতিক্রম করে তাঁর যাত্রা তদানীন্তন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে মনোরঞ্জন দান করে। তাঁর যাত্রাপালার প্রভাব ও জনপ্রিয়তার বশে নানা যাত্রাদল গড়ে ওঠে। সেগুলির মধ্যে— 'শশী অধিকারীর দল', 'অহিভূষণ ভট্টাচার্যের দল', বৌকুণ্ঠর দল', 'প্রসন্ন নিয়োগীর দল' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। যাত্রাভিনয়ের ইতিহাসে মতিলাল রায়ের যুগকে 'স্বর্ণযুগ' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। মথুরনাথ সাহা তাঁর সমকালীন এক প্রখ্যাত যাত্রাপালার স্রষ্টা ও অভিনেতা। মতিলাল রায়ের মৃত্যুর পর ধর্মদাস ও উপেন্দ্র নারায়ণ পালাকর্মের মাধ্যমে পিতৃস্মৃতি বজায় রাখেন। মতিলাল রায়ের সমকালীন অভিনেতা ও

রচনাকার মথুরনাথ সাহা 'থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি' সৃষ্টি করে যুগরুচির প্রতি লক্ষ রেখে উপস্থাপনারীতি, পালারচনা, অভিনয় ধারা, ব্যবসায়িক ভাবনা ইত্যাদির প্রকাশ ঘটিয়ে ছিলেন। 'ভৃগুচরিত', 'পদ্মিনী' ইত্যাদি পালা এই যাত্রাদলের শ্রেষ্ঠ অভিনয় বলে খ্যাত। তিনিই প্রথম যাত্রাপালায় কোরাস গানের প্রচলনের পাশাপাশি প্রবহমান 'জুড়িরগানকে' উঠিয়ে দেন। সিনেমা-থিয়েটার থেকে শিল্পী আনয়ন সহ 'ক্লারিওনেট' বাদ্যযন্ত্রের প্রথম ব্যবহার তাঁর-ই হাত ধরে। তিনিই যাত্রাকে সর্বপ্রথম থিয়েটারের অনেক কাছাকাছি নিয়ে আসেন। পৌরাণিক, ভক্তিমূলক কাহিনির পাশাপাশি ঐতিহাসিক উপাদানের সাহায্যে বাংলা যাত্রাপালায় তিনিই সর্বপ্রথম হরিপদ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মিনী' নাটকের অভিনয় করেন। এ প্রসঙ্গে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন— ''বিংশ শতকের প্রথম দশক হইতে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ও মথুরনাথ সাহার প্রচেষ্টায় যাত্রায় নৃত্যগীতের সঙ্গে অভিনয়ের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিকতর মাত্রায় বাড়িতে আরম্ভ করায় যাত্রা আর গীতাভিনয় নামে চিহ্নিত রহিল না।''[২১]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন কর্তৃক 'বঙ্গ-ভঙ্গ' হলে জাতীয় জীবনে এর প্রভাব এসে পড়ে। বাংলা পরিশীলিত সাহিত্যিক নাটকের পাশাপাশি এর অভিঘাত এসে পড়ে লোকনাট্য ও যাত্রাপালায়। দেশাত্মবোধ ও সমাজ সংস্কারের বাণী সাধারণ মানুষের কাছে তখন পৌঁছে দেওয়া শুরু হয় যাত্রার মাধ্যমে। চারণকবি মুকুন্দ দাসের হাত ধরেই শুরু হল সামাজিক বিষয়ে যাত্রাপালা রচনা। ১৮৭৮ সালে ঢাকার বিক্রমপুর পরগনা অন্তর্গত 'বানারি' গ্রামে তাঁর জন্ম। মূল নাম যজ্ঞেশ্বর দে (যজ্ঞা)। পিতা-গুরুদয়াল দে, মাতা- শ্যামাসুন্দরী দেবী। ''তিনি সামাজিক যাত্রা গাহিয়া চারণকবির দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মুকুন্দ দাস সমগ্র বাংলাদেশকে স্বদেশী যাত্রায় মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। গান ও বক্তৃতা অবলম্বনে সামাজিক স্বদেশী যাত্রা পরিবেশনে তাঁহার বিশেষ ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ছিল।''[২২]

বাংলা যাত্রার 'নবযুগের প্রবর্তক' রূপে খ্যাত মুকুন্দ দাস ১৯০৫ সালে ''স্বদেশী যাত্রাপার্টি'' নামক একটি যাত্রাদল সৃষ্টি করেন। তিনিই প্রথম বাংলার যাত্রাশিল্পী যিনি স্বদেশ সেবায় ব্রতী হয়ে কারাবরণ করেন। 'মাতৃপূজা', 'সমাজ' 'পল্লীসেবা' প্রভৃতি তাঁর সৃষ্ট স্বদেশচেতনামূলক পালাগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কাহিনির প্রয়োজনে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত গানও তাঁর পালায় ব্যবহার করেছিলেন। বাংলা যাত্রাপালার বিবর্তনের ইতিহাসে বিশশতকের ভোলানাথ রায়, ধনকৃষ্ণ সেন-এর অবদানও যথেষ্ট। ভোলানাথ রায়ের রচিত কয়েকটি যাত্রাপালা হল— আদিশূর (১৯২১), কৈকেয়ী (১৯২৩), দাক্ষিণাত্য (১৯২৬) ইত্যাদি।

তাঁর পূর্বে কিংবা সমকালে যাত্রায় ব্যবহৃত দীর্ঘ সংলাপকে ভোলানাথ কিছুটা সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সার্থক চরিত্রসৃষ্টি, মার্জিত হাস্যরসের প্রয়োগ, সংগীতের কথা সৃষ্টিতে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

ভোলানাথের মৃত্যুর পর ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রার মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে সেতুবন্ধন করেন। যাত্রা জগতে যাঁর নাম ছিল 'মাষ্টার মশাই'। ১৩০০ বঙ্গাব্দে হুগলী জেলার চণ্ডীতলা থানাধীন 'গরলগাছা' গ্রামে তাঁর জন্ম। সখের থিয়েটারের সংস্পর্শে এসে তিনি পালা রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। তাঁর রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পালা হল— 'ক্ষত্রিয় গৌরব', 'বাসুদেব', 'মায়াচক্র', 'চন্দ্রধর', 'রূপসাধনা রামকৃষ্ণ' 'মিলন', 'কবি কালিদাস', 'মুচির ছেলে' ইত্যাদি। পরবর্তীতে ''আধুনিক যুগে বাংলার লোকনাট্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসাবে যাত্রার রূপান্তর ঘটান পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে। বলা যায় বিশ শতকে বাংলা যাত্রাপালায় ব্রজেন্দ্রকুমার দে ছিলেন একচ্ছত্র সম্রাট। তাঁর আবির্ভাবের আগে থেকেই বাংলা যাত্রা অনেকটা মুখ থুবড়ে পড়েছিল। বাংলা যাত্রাকে এই দৈন্যদশা থেকে তুলে এনে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করেছেন ব্রজেন্দ্র কুমার দে। যাত্রাপালার সবাঙ্গীন পরিবর্তন সাধন করে তিনি একে নতুন রূপে সাজিয়ে তুলেছেন। তাঁর ভাষায়— ''তখন ৫ ঘণ্টা অভিনয় হত। গান ছিল এক একটি পালায় ৩৫/৪০ খানা। কমিক চরিত্রের সঙ্গে পালার যোগ থাকতো না। অশ্লীল ভাঁড়ামির প্রাচুর্য ছিল। ভাষায় প্রাঞ্জলতা ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীই এনে দিয়েছিলেন। আমি তাকে প্রাঞ্জলতর করেছি।''[২৩]

তাঁর মৃতুর পর স্মৃতিচারণ করে নাট্যকার মন্মথ রায় লিখেছেন— ''আধুনিক যাত্রাপালার গোত্রান্তর ঘটাতে তিনি ছিলেন এক অপরাজেয় কারিগর। যাত্রাগানের প্রচলিত সুদীর্ঘ সংলাপকে স্বাভাবিক, সংক্ষিপ্ত ও সরল সংলাপে পরিণত করা ছিল তাঁর অভিনব কীর্তি। যাত্রাগানে ঘটনা সংস্থাপনে প্রথম থেকেই নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি করে শ্রোতার মনোযোগ দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করে যান, যাতে সংক্ষিপ্ত সংলাপও শ্রোতা অবহেলা করার সুযোগ পান না। ... ব্রজেন্দ্রকুমারের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি যাত্রায় কাল্পনিক কাহিনী চল করেছেন। বহু বিখ্যাত চরিত্রের নব মূল্যায়নের কৃতিত্বও অর্জন করেছেন তিনি। যেমন কৈকেয়ী, শকুনি, দুর্যোধন, জাহান্দার শাহ, কায়কোবাদ, রিজিয়া। হাস্যরসকে পালার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে দেওয়া এবং আদিরসের প্রাবল্যহ্রাস তাঁর দুটি বৈশিষ্ট্য।''[২৪]

শতাধিক যাত্রাপালার রচয়িতা ব্রজেন্দ্রকুমার দে'র পালাগুলিকে বিষয় অনুসারে এভাবে বিভাজন করা যেতে পারে।[২৫] পৌরাণিক পালা (স্বর্ণলতা, লীলাবসান, সতীর পতি, কৃষ্ণ শকুনি, সীতার বনবাস ইত্যাদি); ঐতিহাসিক পালা (বঙ্গবীর, রক্ততিলক, বর্গী এল দেশে, দুর্গাদাস, কালাপাহাড় ইত্যাদি); সামাজিক পালা (সমাজ, মানুষ, পরশমণি, প্লাবন, মাটির

কান্না ইত্যাদি); জীবনী নাটক (করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর, শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি, নটী বিনোদিনী, বিদ্রোহী নজরুল ইত্যাদি); রূপক নাটক (মায়ের ডাক, সবার দেবতা); কিংবদন্তি (পাহাড়ের চোখে জল, কাজীর বিচার); পাঁচালি পালা (ধর্মের হাট, সবার দেবতা); পল্লীগাথা (সোনাই দীঘি, মহুয়া, সতীর ঘাট, ঝড়ের দোলা ইত্যাদি); বাংলা মঙ্গলকাব্য বিষয়ক পালা (ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল); কাল্পনিক পালা (রাজনন্দিনী, সমাজের বলি, ভারততীর্থ, সত্যাশ্রয়ী, রক্তের আলপনা ইত্যাদি); রবীন্দ্র-কবিতা অনুসারী পালা ('প্রতিশোধ' - 'মস্তক বিক্রয়' কবিতা অবলম্বনে, 'শেষ আরতি' - 'পূজারিণী' কবিতা অবলম্বনে, 'শেষ অঞ্জলি' - 'বিবাহ' কবিতা অবলম্বনে ইত্যাদি) এবং ভক্তিমূলক পালা (পতিতের ভগবান ও বিল্বমঙ্গল)।

বিশ দশকের ষাটের দশক থেকে চলচ্চিত্র ও নাটকের জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখে বদলাতে থাকে বাংলা যাত্রার গতি প্রকৃতি। নাট্যকারদের দিয়ে শুরু হয় পালা রচনা। প্রতিযোগিতায় যাত্রাকে টিঁকিয়ে রাখার জন্য অত্যাধুনিক টেকনোলজির ব্যবহার শুরু হয়। এর ফলে খোলামঞ্চেও আলোকসজ্জায় চমক দেখা দেয়।

বাংলা যাত্রার দুটি বিভাগ। একটি ধর্মকেন্দ্রিক লোকনাটক প্রভাবিত (আদিরূপ); অন্যটি আধুনিক রূপ। এই আধুনিকরূপ লোকনাটক ও থিয়েটারের মিশ্রিত রূপ। সংগীত বাহুল্য, মেলোড্রামাটিক উচ্চারণ সহ বিষয়বস্তুর গঠনে পঞ্চমাঙ্ক রীতির ছাপ ঘটেছে আধুনিক রূপটিতে। বর্তমানকালের যাত্রা অতিনাটকীয় এক শিল্পকলা। সংলাপ উচ্চারণ, উপস্থাপন, আলোর বাহাদুরি, রকমারি প্রসাধনী সামগ্রির ব্যবহার সহ নামকরণেও থাকে আড়ম্বরতা। ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 'লক্ষ্মীর পদচিহ্ন', 'পাঁচ পয়সার পৃথিবী', মহাদেব হালদার রচিত 'জ্বলন্ত চিতায় জীবন বধূ' রঞ্জন দেবনাথের 'এক পয়সার বৌ' ইত্যাদি অসংখ্য যাত্রাপালায় চোখে পড়ে অতিনাটকীয়তার ছাপ।

সূত্রনির্দেশ :

১। ড. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা, প্রথম প্রকাশ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৬৭, পৃ. ১২৪।
২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।
৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।
৪। নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ, ১৫ খণ্ড।
৫। সুকুমার সেন, চর্যাগীতি পদাবলী, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৬১।
৬। সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত পৃ. ৬১।
৭। ড. হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য, যাত্রাগানে মতিলাল ও তার সম্প্রদায়, কলকাতা, পৃ. ৪।

৮। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৯৩-৩৯৪।
৯। ড. অজিত কুমার ঘোষ, যাত্রা সেকাল ও একাল, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ৭মবর্ষ, ২য় সংখ্যা - ১৪০১ বাংলা, পৃ. ১৬৫।
১০। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।
১১। ড. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪-১২৫।
১২। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮।
১৩। ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, যাত্রাগানের গোড়ার কথা, নাট্যলোক, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ১৩৭৩।
১৪। শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী, বর্ধমান সম্মিলনী সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা, কলকাতা, প.ব.।
১৫। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বিবিধার্থ সংগ্রহ, ১৮৫৯ সাল, কলকাতা, পৃ. ১১৩।
১৬। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বঙ্গসংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা, লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪।
১৭। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যাত্রার ইতিবৃত্ত, বঙ্গদর্শন, ১৮৮৩ ইং , পৃ. ৫১২-৫১৩।
১৮। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, যাত্রা লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৪০১, পৃ. ১৪৯।
১৯। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রাগুক্ত, কলকাতা, পৃ. ১০৯।
২০। গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ, যাত্রাশিল্পের ইতিহাস, কলকাতা, পৃ. ১২৪।
২১। ড. হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১।
২২। ড. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত পৃ. ৩০২।
২৩। দেবযানী মুখোপাধ্যায়, পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে ও বাঙলা যাত্রা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা,১৪১৩, পৃ. ১৮।
২৪। প্রাগুক্ত, পৃ ২১৮।
২৫। প্রাগুক্ত, পৃ ২২-২৫।

প্রসেনিয়াম রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক

।। এক।।

পাশ্চাত্য নাট্যধারার প্রধান দুটি শাখার মধ্যে একটি 'এপিক', অন্যটি 'প্রসেনিয়াম'। ব্রেশটের 'এপিক থিয়েটার' সর্বাধুনিক নাট্যরীতি। এই থিয়েটারের মূলনীতি হল এতে অভিনয় দ্বারা কখনো দর্শককে মোহাবিষ্ট করা হয় না। অন্যদিকে, প্রসেনিয়াম রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চে একটি কল্পনার জগৎ এবং দর্শকদের মধ্যে একটি বিভ্রম তৈরি করা হয়।

বিশ্ব রঙ্গমঞ্চের প্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায়, প্রসেনিয়াম পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই বহুল প্রচলিত ও সমাদৃত। খ্রিঃ পূর্ব যুগ থেকে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই থিয়েটার ভাবনা মধ্যযুগের ইউরোপে এক সুনির্দিষ্ট রূপ পেতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মূলত গ্রিক ভাবনা সূত্রে এই থিয়েটার সম্পর্কিত ধারণা গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। পরবর্তীতে ইংরেজ ও ফরাসিদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই থিয়েটার বিশ্বের প্রায় সব দেশগুলোতে ক্রমান্বয়ে বিস্তৃতি লাভ করে। ভারতবর্ষেও প্রসেনিয়াম রঙ্গমঞ্চের প্রবর্তক ইংরেজরাই। এ সম্পর্কে দর্শন চৌধুরী বলেন, ''অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডে যে রকম প্রসেনিয়াম থিয়েটার চালু ছিল, ইংরেজরা সেই থিয়েটারই ভারতবর্ষে তথা বাংলায় নিয়ে এলো। ঐ মডেলে থিয়েটার তৈরি হল কলকাতায়। ইংরেজদের আনুকূল্যে ও উৎসাহে। ততদিনে ইংলণ্ডে প্রসেনিয়াম থিয়েটার ঘেরা প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে আবদ্ধ হয়েছে। আর খোলা জায়গায় নেই। সেই প্রেক্ষাপটের একদিকে উঁচু জায়গায় প্রসেনিয়াম স্টেজ। এই মঞ্চের সামনে তৈরি হল দর্শকাসন। এবং সবটা ঘিরে তৈরি হল 'থিয়েটার হল' বা প্রেক্ষাগৃহ বা নাট্যশালা বা রঙ্গালয়।'' [১]

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে প্রসেনিয়াম রঙ্গমঞ্চের একটি সুনির্দিষ্ট সর্বকালীন সংজ্ঞা প্রদান করা খুব সহজসাধ্য নয়। কেননা, বিশ্ব প্রেক্ষিতে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বহু শতাব্দী ব্যাপী ইতিহাস রয়েছে। তাছাড়া, কালের পরিবর্তনে এই নাট্যমঞ্চের অনেক বিবর্তনও ঘটেছে। তবে সেই সঙ্গে এটাও ঠিক যে আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক যুগে নানা আঙ্গিকে এই রঙ্গমঞ্চের বিবর্তন ঘটলেও এর মৌলিক ধরন কিন্তু একই থেকে গেছে।

বলাবাহুল্য, প্রসেনিয়াম রঙ্গমঞ্চ ও আজকের দিনের 'Second Theatre' সার্বিক বিচারে প্রায় সমরূপী; একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। স্বল্পকথায় বললে যে সকল থিয়েটারে একটা প্রেক্ষাগৃহ থাকে, দর্শকদের বসবার নির্দিষ্ট আসন থাকে, অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট মঞ্চ থাকে, মঞ্চের তিন দিক ঘেরা সামনের দিক খোলা, সামনে পর্দা, মঞ্চের দু-ধারে থাকে অনেকগুলো উইংস (Wings, যে গুলো দিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মঞ্চে প্রবেশ করে), পেছনে থাকে সাজঘর, আলোর ব্যবস্থা সহ যন্ত্রানুষঙ্গ ও সংগীতের ব্যবহার সেই ধরনের থিয়েটারকেই বলা হয় প্রসেনিয়াম রঙ্গমঞ্চ বা থিয়েটার।

প্রাচীন গ্রিসে প্রসেনিয়াম থিয়েটার সম্পর্কিত ভাবনা প্রথম গড়ে উঠেছিল। গ্রিকের জনপ্রিয় দেবী ডায়োনিসাসের পূজা ও আরাধনার পর তাঁর সামনে যে স্থানে নৃত্য, গীত ও নাটকের অভিনয় হত সে স্থান skene (স্কিন) নামে পরিচিত ছিল। এর সামনে Orchestra নামে গোলাকৃতি স্থান থাকত; এরও সামনে ছিল পাহাড়ের ঢালু জমিতে গ্যালারির মতো করে দর্শকাসন। পরবর্তীতে রোমানযুগে এসে অভিনয়ের সুবিধার

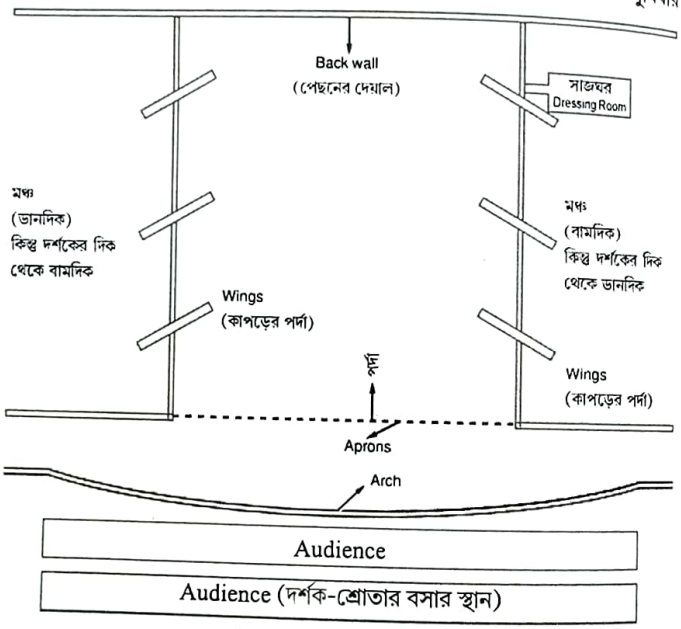

(প্রসেনিয়াম রঙ্গমঞ্চের একটি স্ক্যাচ)

(সূত্র ঃ আন্তর্জাল)

জন্য সেই Skene-এর সামনে কিছু জায়গা বাড়িয়ে এক Platform (প্ল্যাটফর্ম)-এর মতো তৈরি করা হল এবং Orchestra ও Skene-এর মধ্যবর্তী জায়গা জুড়ে দেওয়া হল। Skene-এর সামনে 'Pro'-অংশটি জুড়ার ফলে নাম হয়ে গেল 'Proskenion' অর্থ পর্দার সামনে। তার পরবর্তীতে Orchestra-এর গোলাকৃতি জায়গা তুলে দিয়ে অর্ধবৃত্তকারভাবে তার অংশটিকে Skene-এর সামনে জুড়ে দেওয়ার ফলে সেই অংশটি ধনুক (Arch) এর আকারে Skene-এর সঙ্গে যুক্ত হল। পরিচয় লাভ করল Arch Proskenion থিয়েটার নামে। ইংলণ্ডে প্রচার লাভের সময় এই থিয়েটারের বানানে গ্রিক 'K' এর বদলে ইংরেজি 'C' বর্ণের ব্যবহার চালু হল। নাম হল 'Proscenium'। এই নামকরণে পৌঁছোতে তিনটি ধাপ সক্রিয় ছিল। সেগুলো হলো— গ্রীক 'Skene', থেকে রোমান 'Proskenion', তারপর ইংরেজি 'Proscenium' (প্রসেনিয়াম)।

বাংলাদেশের রঙ্গালয়ের ইতিহাসে এক বহুশ্রুত নাম গেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেডেফ। নাট্যরসিক এই ব্যক্তির হাত ধরেই বাংলাদেশে প্রোসেনিয়াম রঙ্গমঞ্চের সার্থক প্রতিষ্ঠা। তবে একথা অবশ্যই বলা প্রয়োজন যে লেবেডেফ-এর পূর্বেও এদেশে বিদেশি রঙ্গালয়ের প্রচলন ছিল। এই রঙ্গালয়গুলোতে শুধুমাত্র ইংরেজ দর্শকদের সার্বিক মনোরঞ্জনের জন্য ইংরেজি নাটক মঞ্চস্থ হতো। লেবেডেফ-এর পূর্বে বিদেশিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দুটি বিখ্যাত রঙ্গালয় হলো— 'ওল্ড প্লে হাউস' (Old Play House) এবং 'দি নিউ প্লে হাউস' বা 'ক্যালকাটা থিয়েটার (The New Play House/Calcutta Theatre)।

আমাদের আলোচ্য বিষয় বঙ্গ-রঙ্গালয়ে প্রোসেনিয়াম থিয়েটার। বঙ্গদেশের প্রোসেনিয়াম রঙ্গমঞ্চে সে সমস্ত বাংলা নাটক অভিনীত বা মঞ্চস্থ হয়েছে সেগুলোকে সাধারণত তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। যেমন—

(ক) গেরাসিম লেবেডেফ প্রতিষ্ঠিত নাট্যমঞ্চে অভিনীত বাংলা অনূদিত নাটক।

(খ) শৌখিন নাট্যশালায় অভিনীত অনূদিত ও মৌলিক বাংলা নাটক; এবং

(খ) ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও বাংলা নাটকের অভিনয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, লেবেডেফ বাংলা প্রোসেনিয়াম রঙ্গমঞ্চে যে সমস্ত নাটক মঞ্চস্থ করিয়েছিলেন এর সবগুলোই মূলত অন্যভাষা থেকে বাংলায় অনূদিত। আসলে লেবেডেফ এদেশের নাট্যমোদি দর্শকের চাহিদা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালা 'The Bengal Theatre' (১৭৯৫)-এ অনূদিত বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করার অবকাশ তৈরি করে দিয়েছিলেন। তাঁর এই থিয়েটারে যে দুটি ইংরেজি নাটক বাংলায় অনুবাদ করে মঞ্চস্থ করা হয়েছিল সেই নাটক দুটি— 'The Disguise' ও 'Love is the Best Doctor'। প্রথমটির বাংলা অনুবাদ হয়েছিল 'কাল্পনিক

সংবদল অথবা সাজবদল' নামে। The disguise-এর রচয়িতা ছিলেন নাট্যকার রিচার্ড পল জড্রেল। দ্বিতীয়টি কী নামে অনূদিত হয়েছিল তা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। 'The Disguise' নাটকের জন্য লেভেডেফ প্রদত্ত বিজ্ঞাপনটি ছিল এরূপ— "Mr. Lebedeff's New Theatre in the Domtullah, Decorated in the Bengalee style will be opned very shortly with a play called 'The Disguise'. The character to be supported by performers of both sexes, to commence with vocal and instrumental Music called, The Indian Serenade." এদেশীয় দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য 'কাল্পনিক সংবদল অথবা সাজবদল' নাটকটিতে পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গে ভারতীয় কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতের আশ্চর্য যুগলবন্দি তৈরি করেছিলেন। সেই সঙ্গে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের কিছু অংশ নাটকটিতে সংগীত রূপে তুলে ধরা হয়েছিল।[১] পরবর্তীকালে কলকাতায় মুষ্টিমেয় অভিজাত ও ধনবান ব্যক্তিদের উৎসাহ ও উদ্যোগে প্রোসেনিয়াম ধাঁচে কিছু মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। এক্ষেত্রে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার' (১৮৩১-৩২)-এর প্রসঙ্গ। বলা হয় বাঙালি প্রতিষ্ঠিত এটিই প্রথম প্রোসেনিয়াম নাট্যমঞ্চ। কিন্তু এই থিয়েটারে বাংলা নাটক অভিনীত হবার কোনো প্রমাণ আজপর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এরপর ১৮৩৩-৩৫ খ্রিস্টাব্দে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল 'বিদ্যাসুন্দর পালা'। উল্লেখ্য যে, এই নাটকটি 'প্রোসেনিয়াম রঙ্গমঞ্চে অভিনীত প্রথম বাংলা নাটক। 'বিদ্যাসুন্দর পালা' অভিনয়ের পর দীর্ঘকাল বাংলা নাটক অভিনীত হয়নি। এই কারণেই হয়তো লক্ষ করা যায়, বাংলা নাটকের অভিনয়ের জন্য কিছু সাময়িক পত্রে এদেশীয় দর্শকদের দাবি ও আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছিল। দর্শকদের এই অভাব পূরণের জন্য আশুতোষ দেব প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় নন্দকুমার রায় অনূদিত 'শকুন্তলা' মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৮৫৭ সালের ৩১ জানুয়ারি। উক্ত নাটক মঞ্চস্থ হবার এক মাস পর রামানারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নামক প্রথম বাংলা মৌলিক নাটকটি চড়ডাঙ্গার রোডে রাজময় বসাকের বাড়িতে স্থাপিত প্রোসেনিয়াম মঞ্চে চারবার অভিনীত হয়। প্রথমবার নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল মার্চ, ১৮৫৭ খ্রিঃ। ১৮৫৬ খ্রিঃ রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত 'বেণীসংহার' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়েছিল কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে। এরপর প্রতিষ্ঠিত হয় বেলগাছিয়া নাট্যশালা। এই নাট্যশালায় রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত 'রত্নাবলী' এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক অভিনীত হয়। ১৮৫৯, ২৩ এপ্রিল উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয় মেট্রোপলিটান থিয়েটারে। প্রোসেনিয়াম ধাঁচের আরেকটি রঙ্গমঞ্চ পাথুরিয়াঘাটা। এই রঙ্গমঞ্চে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন বিরচিত 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক, রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রহসন 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' এবং ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে 'চক্ষুদান', 'উভয়সঙ্কট', 'রুক্মিণী হরণ' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়।

১৮৬৫-৬৭ খ্রিস্টাব্দে সৃষ্ট জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় মধুসূদনের 'কৃষ্ণ কুমারী' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা'।[২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিদেশি প্রেসেনিয়াম রঙ্গমঞ্চের প্রভাবে গড়ে ওঠা শখের নাট্যশালাগুলোতে প্রথম দিকে বাংলা নাটকের অভাব হেতু মূলত ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটকই অভিনীত হতো। তবে একসময় এই নাট্যশালাগুলোকে কেন্দ্র করে অনেকেই বাংলা মৌলিক নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এবং তাঁদের রচনাগুলো দর্শকদের বিশেষ প্রশংসা যে কুড়িয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। কারণ দীর্ঘদিন থেকে বাংলার রঙ্গমঞ্চে যে সমস্ত অনূদিত গুরুগম্ভীর নাটক অভিনীত হয়ে আসছিল, সেগুলো সাধারণ দর্শকদের আকর্ষিত করতে পারতো না। তাছাড়া তখনও সাধারণ দর্শকদের থিয়েটারে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল না। দর্শকদের সিংহভাগ ছিল অভিজাত ও উচ্চশিক্ষিত লোকেরা। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হলে বঙ্গ রঙ্গালয়ে সাধারণ দর্শকের অবাধ প্রবেশাধিকারের সুযোগ ঘটে। টিকিট বিক্রয় করে এই প্রথম নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করে নাট্যশালাকে পেশাদারি হিসেবে গড়ে তোলা হলো। উল্লেখ্য, 'ন্যাশনাল থিয়েটারে'র স্থায়ী মঞ্চ ছিল না। মাসিক চল্লিশ টাকার বিনিময়ে চিৎপুরের মধুসূদন সান্যালের বাড়ির উঠোন ভাড়া নিয়ে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করে টিকিট বিক্রির মাধ্যমে মঞ্চস্থ করা হল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক। এই নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়েই বাংলা মৌলিক নাটকের পেশাদার অভিনয়ের জয়যাত্রা শুরু হলো। 'নীলদর্পণ' এর পর 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' ক্রমান্বয়ে অভিনীত হয় 'জামাই বারিক', 'সধবার একাদশী', 'নবীন তপস্বিনী', 'লীলাবতী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'নব নাটক', 'নয়শো রুপেয়া' ইত্যাদি নাটক।[৩]

তারপর বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে একে একে গড়ে ওঠে 'হিন্দু ন্যাশানাল থিয়েটার', 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার', 'বেঙ্গল থিয়েটার' ইত্যাদি। এই রঙ্গমঞ্চগুলোতে একদিকে যেমন পুরোদস্তুর মৌলিক বাংলা নাটকের অভিনয় শুরু হয়, অন্যদিকে বাংলার রঙ্গমঞ্চ অভিজাত ও ধনীক শ্রেণির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সাধারণ দর্শকদের জন্য অবারিত হলো।

সূত্রনির্দেশ :

১। ড. অজিত কুমার ঘোষ, নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ, ৪র্থ সংস্করণ এপ্রিল ২০১০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৬২।
২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৫২
৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

থার্ড থিয়েটার : উৎস ও স্বরূপ সন্ধান

নাট্যকার বাদল সরকার[১] প্রথাগত থিয়েটারের সঙ্গে বহুদিন থেকে যুক্ত থাকার ফলে এই ধরনের থিয়েটারের কিছু সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাই এর থেকে বেরিয়ে এসে থিয়েটারের এক নতুন রূপের সন্ধান করছিলেন যেখানে সাধারণ দর্শককে আরও বেশি আকর্ষণ করা সম্ভব হবে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি দেশীয় লোকনাটক এবং পাশ্চাত্য মঞ্চনাটকের সমন্বয়ে এক নতুন নাট্যরীতির প্রবর্তন করেন। এর নাম থার্ড থিয়েটার। থার্ড থিয়েটারের যাত্রা শুরু হয় বিশ শতকের সাতের দশকে। পথনাটকের বিবর্তন ধারায় যে কয়টি থিয়েটারের রূপ-রীতি ও দর্শন দর্শক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো, তার একটি বাদল সরকারের 'থার্ড থিয়েটার' এবং অন্যটি সঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ফোরাম থিয়েটার'। থার্ড থিয়েটার পরবর্তীকালে 'বিকল্প থিয়েটার' নামেও পরিচিতি পায়। অনেকে মনে করেন থার্ড থিয়েটার মানেই স্ট্রিট থিয়েটার। এই ধারণা ভুল। কারণ সব থার্ড থিয়েটার স্ট্রিট থিয়েটার নয়। বাদল সরকার জানান, "Street threatre in a way is Third Theatre. But all third theatre is not street theatre."[২] প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি তাঁর আরেকটি মন্তব্য, ''আমাদের থিয়েটারকে অনেকে স্ট্রিট থিয়েটার বলে। আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে আমাদের থার্ড থিয়েটারে স্ট্রিট থিয়েটার ছাড়াও আরো একটা ডাইমেনসন আছে। আমরা স্ট্রিট ছাড়া ঘরেও করি।"[৩]

থার্ড থিয়েটারের দুটি রূপ— অঙ্গনমঞ্চ ও মুক্তমঞ্চ। অঙ্গনমঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং দর্শকের মধ্যে দূরত্বের বাধ্যবাধকতা থাকে না। একটি নির্দিষ্ট কক্ষে দর্শক চারদিক ঘিরে বসে আর মাঝখানে মঞ্চস্থ হয় নাটক। মুক্তমঞ্চে নাটক অভিনীত হয় খোলা আকাশের নীচে। নাটকের পাত্র-পাত্রীদের পোশাক-আশাক, সাজসজ্জা, এমনকি আবহ সঙ্গীতেরও প্রয়োজন নেই। প্রসেনিয়াম থিয়েটারের গন্ডি থেকে থিয়েটারকে বের করে নিয়ে আসার প্রথম পদক্ষেপ অঙ্গনমঞ্চ। তবে অঙ্গনমঞ্চে দর্শকের জন্য অপেক্ষা করতে হতো। এই অসুবিধা দূর করা হয়েছে মুক্তমঞ্চে। এক্ষেত্রে দর্শকের জন্য অপেক্ষা না করে সমবেত দর্শকের কাছে গিয়ে নাটক অভিনীত হয়। এইভাবে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের অসুবিধা বা বাধাগুলি— অভিনেতা-অভিনেত্রী ও দর্শকের মধ্যেকার দূরত্ব, দর্শক ও মঞ্চের

ব্যবধান, আলো-অন্ধকারের ধাঁধা থার্ড থিয়েটারে অপসারিত করা হলো। লোকনাটকের একটা আকর্ষণীয়তা ছিল বা আছে। কিন্তু বাদল সরকার অনুভব করেন যে, অধিকাংশ লোকনাটকে রাজা-রানি, দেব-দেবীর গল্প পরিবেশন করে সাধারণ মানুষকে নিয়তি নির্ভর করে তোলা হয়। অন্যদিকে প্রসেনিয়াম থিয়েটারে সমাজের বিবর্তন বা উন্নয়নের প্রকল্প উদ্‌ভাসিত করা সম্ভব। কিন্তু সমাজের নিচুতলার মানুষেরা এখানে উপেক্ষিত থেকে যাবে। সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম কারিগর এইসব মানুষদের প্রসেনিয়াম থিয়েটারে যুক্ত করার কোনো উপায় নেই। সমকালীন লোকনাটকে প্রদর্শিত ভাগ্য-নির্ভরশীলতা এবং প্রসেনিয়াম থিয়েটারের উক্ত সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে তিনি নিতান্ত সাধারণ মানুষকে থিয়েটারে জড়িত করার লক্ষ্যে এই নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। তাঁর থিয়েটারকে দর্শকের কাছে নিয়ে গিয়ে সাধারণ মানুষকে দর্শক করে তোলার প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা নিয়েই থার্ড থিয়েটারের প্রবর্তনা।

প্রসেনিয়াম নাট্যমঞ্চের নাট্যকার ও অভিনেতা থাকাকালীন বাদল সরকারের মাথায় বিকল্প মঞ্চের চিন্তাধারা কাজ করতে শুরু করে। শুভেন্দু সরকার তাঁর 'বাদল সরকার : বিকল্প নাটক, বিকল্প মঞ্চ' শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বাদল সরকারের একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন, যেখানে তিনি বলছেন, ''অঙ্গনমঞ্চে বিশ্বাস আমার রাতারাতি আসেনি। ১৯৬৮ সালে যখন প্রথম Theatre in the Round দেখি বিদেশে, তখন থেকেই চিন্তার সূত্রপাত। তারপর আরো দেখে, বই পড়ে, থিয়েটার করতে গিয়ে, নাটক লিখতে গিয়ে অল্প অল্প অভিনেতা ও দর্শক সম্বন্ধে কতকগুলো ধারণা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে।"[৪] ''পথসেনা' নাট্যদলের কর্মী শুভময় দত্ত তাঁর 'শতাব্দীর কুয়াশা পেরিয়ে' প্রবন্ধে জানাচ্ছেন, ১৯৭১ সালে গৌরকিশোর ঘোষ এর গল্প অবলম্বনে বাদল সরকার রচনা করেন 'সাগিনা মাহাতো' নাটক। এ সম্পর্কে বাদল সরকার বলছেন, ''যখন আমি সাগিনা মাহাতো লিখলাম তখনই উপলব্ধি করলাম মঞ্চে অভিনয় ছাড়ার সময় উপস্থিত।" ১৯৭২-এ শতাব্দী মঞ্চস্থ করল গিরিশচন্দ্রের 'আবু হোসেন'-এর ভিন্ন নাট্যরূপ। তিনি জানান, ''আমরা ঘোষণা করতাম— রচনা গিরিশঘোষ। বিকৃতি - বাদল সরকার। এ নাটকে প্রচুর সাফল্য এলো। তবু মঞ্চ ছাড়লো 'শতাব্দী'।"[৫] সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বাদল সরকার জানান, ''২৪ অক্টোবর ১৯৭১, সাগিনা মাহাতো প্রথম মঞ্চের বাইরে এল। বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েসন হলে দেখানো হল। নাটক চলাকালীন হঠাৎ আলো নিভে যায়। অন্ধকারের মধ্যেই চলল নাটক। পরে আলো ঠিক করা গেলেও নাটকে মঞ্চসজ্জার লাইট ব্যবহার করা যায়নি। এই অবস্থায় অগণিত দর্শক উপভোগ করলেন নাটক। নবজাগরণের একটা ঢেউ উঠল; বুঝলাম মঞ্চসজ্জা ছাড়াও নাটক চলতে পারে। এরপর 'আবু হোসেন' পরিপূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে প্রসেনিয়াম মঞ্চে অভিনীত না

হওয়ায় অর্থনৈতিক সমস্যাটা প্রকট হয়ে উঠল। তখন মঞ্চ থিয়েটারের রীতি ছেড়ে আমরা থার্ড থিয়েটারের দিকে এগোই। ১৯৭২ সাল থেকে আকাদেমি অফ্ ফাইন আর্টস-এর ঘরে অঙ্গন মঞ্চে আমাদের নাটক চলতে থাকে।"[৬]

ছাত্রজীবন থেকেই বাদল সরকার ছিলেন নাটকের উৎসাহী পাঠক। তাঁর নাট্যজীবনের শুরু কমেডি নাটক রচনার মধ্য দিয়ে। প্রথম দিকে তাঁর লেখা ও অভিনীত নাটক মঞ্চস্থ হয় প্রসেনিয়াম মঞ্চেই। বিশ শতকের ছয় ও সাতের দশকে লেখা 'সলিউশন এক্স' (১৯৫৬), 'বুড়ো পিসীমা' (১৯৫১), 'রাম শ্যাম যদু' (১৯৬১) ইত্যাদি নাটক অভিনীত হয় প্রসেনিয়াম মঞ্চে। পরে কর্মসূত্রে লন্ডন, ফ্রান্স, নাইজেরিয়া, ইত্যাদি দেশ ভ্রমণের সুবাদে সেখানকার সমৃদ্ধ নাট্যশালার অসংখ্য নাট্য প্রযোজনা তাঁর অভিজ্ঞতাকে ঋদ্ধ করতে সাহায্য করে। উল্লেখ্য, লন্ডনে তিনি প্রথম দেখেছিলেন গোলাকৃতি 'এরিনামঞ্চ'। ফ্রান্স ও নাইজেরিয়া অবস্থানকালে তাঁর মাথায় নাট্যদল গড়ার পরিকল্পনা আসে। এই পরিকল্পনার ফলস্বরূপ নাইজেরিয়া থেকে ফিরে ১৯৬৭ সালে কলকাতায় 'শতাব্দী' নামের নাট্যদলের প্রতিষ্ঠা করেন। 'শতাব্দী' নাট্যদল গড়ার কিছুকাল পরে লেখা 'বাঘ' (১৯৬৮), 'কবিকাহিনী' (১৯৬৮), 'প্রলাপ' (১৯৬৯), 'শেষ নেই' (১৯৭০), 'সাগিনা মাহাতো' (১৯৭১) ইত্যাদি অ্যাবসার্ডধর্মী নাটকগুলির সবকটি অভিনীত হয়েছিলো প্রসেনিয়াম মঞ্চে। ১৯৬৯ সালে বাদল সরকার ইউরোপের রাশিয়া, পোলান্ড, চেকোশ্লাভাকিয়া ভ্রমণ করেন। সেই দেশগুলির নাটক ও নাটমঞ্চ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয় তাঁর। ১৯৬৯ সালেই পোলান্ডের খ্যাতনামা নাট্যকার গ্রোটোভস্কি এবং তাঁর 'পুয়োর থিয়েটার' (Poor Threatre) এর সংস্পর্শে আসেন।[৭] পরবর্তীকালে থার্ড থিয়েটার গড়ে তুলতে এই 'পুয়োর থিয়েটার' এর দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তাছাড়া ১৯৭২ সালে আমেরিকা ভ্রমণে গেলে সেখানের রিচার্ড সেহ্কনার (Richard Schechner) এর 'এনভাইরনমেন্টাল থিয়েটার' (Environmental Theatre) এবং জুলিয়ান বেক (Julian Beck) এর 'লিভিং থিয়েটার' (Living Theatre) ও বাদল সরকারকে প্রভাবিত করেছে। ১৯৭৩ সালে 'শতাব্দী' পুরোপুরিভাবে প্রসেনিয়াম ছেড়ে দিয়ে দর্শকের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনে মনোনিবেশ করে।

এবার আসা যাক থার্ড থিয়েটার কী, কেমন এর রূপ-রীতি, প্রসেনিয়াম মঞ্চ থেকে এর পার্থক্য কোথায়, কেনই বা বাদল সরকার প্রসেনিয়াম থেকে সরে এসে থার্ড থিয়েটারের প্রবর্তনা করলেন এইসব জিজ্ঞাসার অনুসন্ধানে। বাংলা নাট্যরীতির প্রেক্ষাপটে লোকনাটককে বলা হয় 'প্রথম থিয়েটার', আর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার প্রভাবপুষ্ট নগরনাট্যকে বলা হয় 'দ্বিতীয় থিয়েটার'। এই দুই ধারার সন্নিবিষ্ট রূপকে বলা হয় 'থার্ড/তৃতীয় থিয়েটার'। উল্লেখ্য, আমাদের দেশে থার্ড থিয়েটার এর প্রবর্তক বাদল

সরকার। কিন্তু থার্ড থিয়েটার নামটি তাঁর প্রদত্ত নয়। ১৯৭১ সালের পর বাদল সরকার অঙ্গনমঞ্চ ও মুক্তমঞ্চের জন্য যেসমস্ত নাটক রচনা করেন বা তাঁর অনুসরণ-অনুকরণে বিভিন্ন অনুগামী নাট্যগোষ্ঠী দ্বারা অভিনীত নাটকগুলি থার্ড থিয়েটারের নাটক নামে পরিচিতি লাভ করে। নাট্য-গবেষকদের প্রদত্ত তথ্য মতে, ১৯৭৮ সালের আগস্ট মাসে বাদল সরকারের দশটি প্রবন্ধ সম্বলিত 'The Third Theatre' নামক গ্রন্থ প্রকাশের পর থেকেই তাঁর নাট্যরীতি পরিচিতি লাভ করে 'থার্ড থিয়েটার' নামে। এই নামকরণ প্রসঙ্গে বাদল সরকার বলেন, "আমি বলিনি (নিজের নাট্যরীতিকে থার্ড থিয়েটার), কিন্তু আমার সহকর্মীরা বলে থাকে। ... এটা একটা চালু হয়ে গেছে। ফলে আমি খানিকটা মেনে নিয়েছি আরকি। এটা একটা নাম দেবার জন্য। কোনো নামই পুরোপুরি অর্থটা তো বহন করে না। কিন্তু আমি জ্ঞানত, আমাদের থিয়েটারকে থার্ড থিয়েটারের রীতি বলিনি। এবং এই বইটার নাম থার্ড থিয়েটার দিয়েছিলাম কেননা এটা একটা বিকল্প থিয়েটার। না প্রথম থিয়েটার অর্থাৎ আমাদের লোকনাট্য, না দ্বিতীয় থিয়েটার অর্থাৎ নগরনাট্য - তার একটা বিকল্প। সুতরাং সেই পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় বলা চলে। এই হিসেবে নামটা দিয়েছিলাম।"[৮] অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত বাদল সরকারের 'Two Plays' বইয়ের দীর্ঘ ভূমিকায় থার্ড থিয়েটারের উদ্ভব সম্পর্কে শুভেন্দু সরকার লিখেছেন, 'Though he formed his own group, Satabdi (Century), in 1967 and started writing, directing and producing for the proscenium theatre, Sircar was becoming more and more aware of the limitations of the conventional stage. In fact, he continued asking himself a few questions:

1. What are the limitations of naturalistic theatre?
2. How can actors communicate directly with the audience?
3. Where lies the essential difference between theatre and cinema?
4. How does one reduce the cost of a proscenium production? It is through the answers to these questions that Badal Sircar succeeded in evolving his own brand of theatre Third Theatre."[৯]

আমেরিকার নাট্য-সমালোচক রবার্ট স্যানফোর্ড ব্রুস্টেইন (Robert Sanford Brustein) তাঁর 'The Third Theatre' (১৯৭০) বইতে থার্ড থিয়েটারের নাটক সম্পর্কে বলেছেন, বাস্তববাদী থিয়েটার ক্রমশ আনন্দহীন হয়ে পড়েছে। অথচ সস্তা বাণিজ্যিক সঙ্গীত মুখর নাটকে এত আনন্দ, এত হাসি যা মানুষের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পেতে সক্ষম। এই দুই ধারার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে তৃতীয় ধারার থিয়েটার।[১০] তাছাড়া

ডেনমার্কের নাট্য পরিচালক ইউজেনিও বার্বার (Eugenio Barba) মতে প্রথম থিয়েটার এবং দ্বিতীয় থিয়েটারে পরিচালকের প্রাধান্য স্বীকৃত। ফলে তাঁরা পরিচালন শৈলী প্রদর্শনের জন্য নাটকে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ইচ্ছেমত ব্যবহার করেন। সেখানে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের স্বাতন্ত্র্য বলে কিছু থাকে না। কিন্তু "তৃতীয় থিয়েটার মানুষের অর্ন্তজীবনের বাণী নিয়ে দর্শকদের আক্রমণ করে, তবে বুদ্ধি বা চিন্তা দিয়ে নয়, দর্শক এক গভীর উপলব্ধি দিয়ে সেই বাণীকে বুঝতে সক্ষম হয়।"[১১] উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বৈশ্বিক নাট্য প্রেক্ষাপটে আলোচিত থার্ড থিয়েটার এর সঙ্গে বাদল সরকারের অঙ্গনমঞ্চ ও মুক্তমঞ্চ রীতির থার্ড থিয়েটার এক নয়।

বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার সম্পর্কে বিশিষ্ট ভাষাবিদ ও প্রাবন্ধিক পবিত্র সরকার লিখেছেন, "বাদলবাবুর মতে থার্ড থিয়েটার একটি দৃষ্টিভঙ্গি, একটি দর্শন, একটি পূর্ণাঙ্গতত্ত্ব। এর পেছনে আছে ভারতের বর্তমান রাজনীতি-অর্থনীতি, বিশ্বগত রাজনীতি-অর্থনীতি সম্বন্ধে কতকগুলি চিন্তা এবং সেইসঙ্গে একটি Prasix বা প্রয়োগের প্রকল্প। অবশ্যই সমাজ বদলের প্রকল্পের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত এই নাট্যকর্ম। বাদলবাবুর দর্শনের এই প্রয়োগাত্মক দিকটিই হল 'থার্ড থিয়েটার'।"[১২] ১৯৭৮ সালে বাদল সরকার তাঁর The Third Theatre বইতে লেখেন— "What we need to do is to analyse both the theatre form to find the exact points of strength and weekness and their causes, and that may give us the clue for an attempt to create a theatre of synthesis a Third Theatre".[১৩] ২০১০ সালের ১১ ডিসেম্বর এক গবেষককে[১৪] দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "অবশ্য তখন ('দ্য থার্ড থিয়েটার' গ্রন্থ প্রকাশের সময়) যে অর্থে বলেছিলাম এখন কিছুটা বদলে গেছে। তখন বলেছিলাম যে আমাদের লোকনাটক আর নগরনাট্য এই দুয়ে সিনথেসিস করে থার্ড থিয়েটার হবে। সেটা থাকেনি। এখন থার্ড থিয়েটার হয়েছে লোকনাটক, নগরনাট্য তারপর একটা বিকল্প থিয়েটার। সেটাই এখন থার্ড থিয়েটার।" 'থিয়েটারের ভাষা' বইতে তিনি বলছেন— "তৃতীয় থিয়েটারের উদ্দেশ্যে নতুন শৈলী, নতুন ভাষা দাবী করবে; কিন্তু এমন আদৌ নয় যে থিয়েটারের শৈলী ও ভাষার রূপান্তর ঘটানোই উদ্দেশ্য ...। তৃতীয় থিয়েটার একটা দর্শন, একটা দৃষ্টিভঙ্গী, একটি ভাবধারা এবং সেই কারণেই স্বভাবতই এই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ একটা আন্দোলন। গবেষণাগারে প্রসূত একটা অভিনব নাট্যশৈলী নয়, মাঠে-ঘাটে পরীক্ষিত যুগের ও সমাজের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা এক বিস্তীর্ণ আন্দোলন এই বিকল্প থিয়েটারের ভিত্তি।"[১৫]

থার্ড থিয়েটার বা বিকল্প থিয়েটারের মূলকথা হলো দর্শকের সঙ্গে সংযোগের মাধ্যমে দর্শক মনে সমাজ পরিবর্তনের তাগিদ জাগিয়ে তোলা। বাদল সরকারের থার্ড

থিয়েটার রাজনৈতিক ভাবনায় ঋদ্ধ হলেও কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের পক্ষপাতী নয়। সাম্যবাদী ও মানবতাবাদী দর্শন তাঁর নাটকের মূল ভাবনা। বাদল সরকার নিজেই বলেছেন, তাঁর থার্ড থিয়েটার শুধু তত্ত্ব বা বিশেষ একটি রূপ নয়, এটি একটি দর্শন, একটি আন্দোলন। ভাবের দিক থেকে তিনি হেনরিক ইবসেন, লিও টলস্টয়, রম্যাঁ রল্যাঁ প্রমুখ বিপ্লববাদী নাট্যকারদের উত্তরসূরি। আবার ভারতীয় লোকনাট্যের আঙ্গিকের প্রভাব বিস্তার ঘটেছে তাঁর থিয়েটার নাটকে। দর্শকের কল্পনাশক্তিকে বাড়িয়ে তোলা থার্ড থিয়েটারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই থিয়েটারের মঞ্চ আবরণহীন। দর্শকসহ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ইতিবাচক শিক্ষালাভ তাঁর প্রবর্তিত থিয়েটারের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। থার্ড থিয়েটারের যেসমস্ত বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি[১৬] আমাদের নজরে পড়ে সেগুলিকে সূত্রাকারে এভাবে সাজিয়ে নেওয়া যায়—

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থিয়েটারের সমন্বয় : থার্ড থিয়েটার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থিয়েটারের সংমিশ্রণ। বাদল সরকার ভারতীয় লোকনাট্যের অর্ন্তনিহিত বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন— জীবন্ত পরিবেশনরীতি, প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কৌশল ইত্যাদি গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে মুক্ত পরিবেশন এবং শিল্পীর শরীরী ভাষায় বা অঙ্গ-চালনায় অধিক গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা পাশ্চাত্যের থিয়েটার থেকে গ্রহণ করেন।

দর্শকের অংশগ্রহণকে অধিক গুরুত্বপ্রদান : বাদল সরকার মনে করতেন, থিয়েটার একটি মানবিক কাজ। প্রতিটি শিল্পের মূলে আছে অভিজ্ঞতা এবং থিয়েটারও এক ধরনের শিল্প যেখানে দর্শকগণ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আসেন। তাঁর মতে, থিয়েটারে অংশগ্রহণকারী ও দর্শকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় থিয়েটার সমাজকে জাগিয়ে তোলার হাতিয়ার হওয়া উচিত। তাই তিনি উন্মুক্ত আকাশের নিচে থিয়েটার করার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ এমনটা হলেই দর্শক সক্রিয়ভাবে থিয়েটারে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এরজন্য তিনি বলতেন, থিয়েটারের জন্য পৃথক কোনো মঞ্চ তৈরি না করে অভিনয় যদি মেঝেতে করা যায় তাহলে দর্শক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে কোনোরূপ দূরত্ব তৈরি হবে না। তখন দুই পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সহাবস্থান থাকবে। অভিনেতা-অভিনেত্রী দর্শকদের স্পষ্ট দেখতে পারবেন, তাদের কাছে পৌঁছতে পারবেন, তাদের মন্তব্য শুনতে পারবেন। এটা হচ্ছে অন্তরঙ্গ থিয়েটার।

প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বিপরীতধর্মী থিয়েটার : থার্ড থিয়েটার প্রকৃতিতে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। প্রসেনিয়াম থিয়েটারে বাস্তবের বিভ্রম তৈরি করার জন্য সম্প্রসারিত মঞ্চ, চোখ ধাঁধানো আলো, সাজ-সরঞ্জাম, অলংকরণ ইত্যাদিতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু থার্ড থিয়েটারে এগুলির থেকে বেশি জোর দেওয়া হয় পরিবেশক অর্থাৎ অভিনেতা-অভিনেত্রীর শরীরী ভাষায়। প্রসেনিয়াম থিয়েটারে দর্শকদের সঙ্গে

দূরত্ব বজায় রাখার জন্য তৈরি করা হয় উঁচু মঞ্চ। অন্যদিকে থার্ড থিয়েটারে এরূপ সন্ত্রান্ত কোনো মঞ্চের প্রয়োজন নেই। বরং দর্শক-পরিবেশকের নৈকট্যই থার্ড থিয়েটারে প্রাধান্য পায়। বক্তব্য বিষয়কে উপস্থাপনের জন্য থার্ড থিয়েটারের অভিনেতারা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের থেকে অনেক বেশি স্বাধীন।

বহনযোগ্যতা, নমনীয়তা ও অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়বহুল : থার্ড থিয়েটারে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মতো ভারি ফার্নিচার, স্পটলাইট, অলংকরণ এবং অন্যান্য ব্যয়বহুল সরঞ্জামের প্রয়োজন নেই বলে এটি সহজেই বহনযোগ্য। থার্ড থিয়েটারে মঞ্চের কোনো প্রয়োজন নেই যেহেতু তাই এই ধরনের থিয়েটারে যেকোনো স্থানে (মুক্তমঞ্চ) নাটক মঞ্চস্থ করা সম্ভব। থার্ড থিয়েটারে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মতো ব্যয়বহুল সরঞ্জামের প্রয়োজন নেই। এমনকি টিকিট বিক্রিরও দরকার নেই, এরজন্য থার্ড থিয়েটার কম ব্যয়সাপেক্ষ। মানবিক সম্পর্কে বিশ্বাসী বাদল সরকার মনে করতেন, থিয়েটার মানবিক কাজ, অর্থ উপার্জনের উৎস নয়।

মঞ্চে নয়, অভিনয়ে গুরুত্ব প্রদান : থার্ড থিয়েটারে মঞ্চ থেকে অভিনয়ে এবং সম্মিলিত মানবিক বোধে বেশি জোর দেওয়া হয়। অভিনেতাদের শিক্ষা দেওয়া হতো যে তাঁরা যেন মিথ্যা বা ভ্রম তৈরি না করে সত্য ও বাস্তব প্রকাশভঙ্গিতে অধিক মনোনিবেশ করেন। বাদল সরকার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বাস্তবধর্মীতার বাধা থেকে মুক্ত করে শরীরী প্রকাশভঙ্গি প্রদর্শনে উৎসাহিত করতেন।

বাদল সরকার নাটক লেখার চেয়ে থিয়েটার করায় অধিক মনোনিবেশ করেন। ভারতীয় সমাজে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মানসিক পরিবর্তন আনতে তিনি থিয়েটারকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি জানতেন, ভারতের মতো দেশে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আনা শুধু থিয়েটারের মাধ্যমে সম্ভব নয়, তবু থিয়েটার এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে। এই ভাবনা থেকে থার্ড থিয়েটারের প্রবর্তন। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে ভারতীয় গ্রামীণ ও শহুরে জীবনে সমান্তরালভাবে দুটি সাংস্কৃতিক ধারা বহমান যা দুটি জীবনধারাকে বিভাজিত করে রেখেছে। এরজন্য এই দুই জীবনধারায় দুটি স্বতন্ত্র ধরনের থিয়েটারের প্রভাব আছে। বাদল সরকার থার্ড থিয়েটার এবং এর জন্য রচিত নাটকের মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহুরে জীবনের মধ্যে এক সমন্বয় তৈরি করে থিয়েটারকে জাতীয়তাবাদী ভাবনার বাহক হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

থিয়েটারকে বাদল সরকার রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় কম্যিউনিস্ট দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি। একসময় দলের কাজকর্মের সমালোচনার জন্য তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু তাই বলে তিনি

তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি বলতেন, দল তাঁকে বহিষ্কৃত করলেও মার্কসবাদের আদর্শ ছিল তাঁর জীবনের সঙ্গী। 'হট্টমালার ওপারে' নাটকে চিত্রিত হয়েছে মার্কসবাদী দর্শন। 'শেষ নাই' নামক আত্মজীবনীমূলক নাটকটিতে তাঁর বিরুদ্ধে দলের উত্থাপিত অভিযোগগুলি এবং এর বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। প্রসেনিয়াম থিয়েটার ছেড়ে মুক্তাঙ্গনের থিয়েটারে যুক্ত হওয়াকে মার্কসবাদী পন্থায় তাঁর ক্রমোত্তরণ বলা যেতে পারে।

পরিবর্তনশীলতায় বিশ্বাসী বাদল সরকার সমস্ত জীবন সমাজের কথা ভেবেছেন। মার্কসবাদী অগ্রগতির পথ ধরেই তিনি মধ্যবিত্তের জীবন-চিত্রণ থেকে সরে এসে শ্রমিক ও কৃষকের জীবন নিয়ে নাটক লিখতে শুরু করেন। এর উজ্জ্বল প্রমাণ 'হট্টমালার ওপারে'। এই নাটকে ধনতন্ত্রের অন্ধকার দিকটিকে তুলে ধরতে কেনারাম ও বেচারাম নামের দুই চোরের চরিত্র অঙ্কন করেছেন। এই দুই চোর শেষ পর্যন্ত চুরির পথ ছেড়ে সুন্দর-সুষ্ঠ জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে একজন রাজমিস্ত্রী ও অন্যজন মালির পেশাকে বেছে নেয়। নাটকটি একটি কোরাসের মাধ্যমে এই বার্তা দিয়ে সমাপ্ত হয় -

এ দুনিয়ায় যা কিছু দরকারী
সাধ্যমত খাটবো সবাই, যার যা দরকার নিয়ে যাবো
কেনাবেচায় কী ফল পাবো?
ভাগ করে সব খাবো,
(এসো) ভাগ করে সব খাবো।
(আমরা) যা কিছু চাই, সবই তো বানাই,
ফালতু কেন বাজার যাবো?
টাকার চাকর কেন হবো?
ভাগ করে সব খাবো,
(এসো) ভাগ করে সব খাবো।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের জগতে নির্দিষ্ট কাহিনি উপস্থাপনের চিরাচরিত রীতির বদল ঘটে বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের হাত ধরে। ছোট ছোট ঘটনার কোলাজ গুরুত্ব পেল এই নাট্যধারায়। শরীর হয়ে উঠলো ভাব ও ভাষা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। এ সম্পর্কে বাদল সরকার বলেছেন, ''প্রতি কথাকে কি করে সর্বাধিক অর্থবহ করে তোলা যায়, দর্শকের চেতনার গভীরে সঞ্চারিত করা যায়— তার অগণিত পদ্ধতির মধ্য থেকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পদ্ধতি বেছে নেওয়াই এই নাটকের নাট্যায়নের এবং নাট্যাভিনয়ের মূল কথা।''[১৭] নাটকের সংলাপে ধারাবাহিকতা রক্ষার রীতি প্রথম বর্জন হয় থার্ড থিয়েটারে। নাটকে গতি ও ছন্দ আনার উদ্দেশ্যে সংলাপের পুনরাবৃত্তি লক্ষিত হয়। একজন অভিনেতা-

অভিনেত্রীর একাধিক চরিত্রে অভিনয় এবং ভাবপ্রকাশের জন্য বিভিন্ন ধরণের মুখের আওয়াজ ও কণ্ঠসঙ্গীত থার্ড থিয়েটারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

থার্ড থিয়েটার নাটকগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এগুলির বিষয়বস্তু। বিষয়বস্তুর মাধ্যমে নাট্যকার তাঁর প্রত্যাশিত বার্তাটি দর্শকের কাছে পরিবেশন করেন। বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার নাটকগুলির বিষয়বস্তুকে আমরা এভাবে বর্গীকৃত করে নিতে পারি[১৮]— জীবনের তাৎপর্য সন্ধান : বাদল সরকারের নাটকগুলির অন্যতম মূল বিষয়বস্তু জীবনের তাৎপর্য অনুসন্ধান। বিষয়টি তাঁর সিরিয়াস নাটকেই নয় শুধু, এ্যাবসার্ড এবং কমিক নাটকেও দৃষ্ট হয়। জীবনের এক নতুন মানে খোঁজার চেষ্টা করেছেন 'শেষ নেই' নাটকে। 'মিছিল' নাটকে আছে জীবন-মৃত্যুর অপ্রতিদ্বন্দ্বী লড়াই। জীবনের মিছিল থেকে মৃত্যুর মিছিলের মধ্যবর্তী সময়ে আমাদের আরও বহু মিছিলের সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'পাগলা ঘোড়া' 'ত্রিংশ শতাব্দী', 'বাকী ইতিহাস', 'শনিবার' ইত্যাদি নাটকেও লক্ষিত হয় এই বিরামহীন অনুসন্ধান।

ইতিহাস : বাদল সরকার কয়েকটি নাটকের প্লট নির্মাণ করেছেন ঐতিহাসিক কাহিনি অবলম্বনে। ব্রিটিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা ভারতের স্বাধীনতা তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চিত্রের মাধ্যমে এই অর্থহীনতাকে স্পষ্টরূপে তুলে ধরেন 'সার্কাস' নাটকে। ইতিহাস অবলম্বনে তাঁর আরেকটি বিখ্যাত নাটক 'স্পার্টাকুস'। স্পার্টাকুস একজন থ্রেসিয়ান, অর্থাৎ প্রাচীন থ্রেস দেশের অধিবাসী। রোমান সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বয়ের ফলে থ্রেসিয়ান সংস্কৃতি একসময় লোপ পায়। বর্তমানে তাদের উত্তরসূরি আছে বুলগেরিয়া, তুর্কি ও গ্রিস দেশে। রোম সেনাবাহিনীতে নিয়োজিত অবস্থায় স্পার্টাকুসকে বন্দি করে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়েছিলো। পরবর্তীকালে বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে রোমান প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাস বিদ্রোহে (ইতিহাসে যেটি 'থার্ড সারভাইল ওয়ার' নামে পরিচিত) একজন প্রথম সারির যোদ্ধা হিসেবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। বাদল সরকার 'স্পার্টাকুস' নাটকে প্রাচীন রোমের দাসপ্রথা এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করেছেন যথার্থ বিশ্লেষকের দৃষ্টিতে। তাঁর 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস' নাটকে ধৃত হয়েছে ভারতীয় ইতিহাসের গৌরবময় দিনগুলির কথা।

বাদল সরকার ছিলেন শ্রেণিহীন সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। এই মতাদর্শ তাঁর নাটকেও প্রতিফলিত। 'স্পার্টাকুস' নাটকে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধের উল্লেখ করে তিনি আসলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার বার্তা দিয়েছেন। 'হট্টমালার ওপারে' নাটকে বাঙালি সমাজে অব্যাহত শোষণের চিত্র তুলে ধরে সাধারণ জনগণকে এসম্পর্কে সচেতন করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন।

যুদ্ধের হিংস্র ও কদর্যরূপ : যুদ্ধের ভয়াবহতার রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন 'উদ্যোগ পর্ব', 'বাসি খবর' ইত্যাদি নাটকে। সমাজের নিষ্ঠুরতা, রাজনৈতিক হত্যাকান্ড বর্ণনার মধ্য দিয়ে সাধারণ দর্শককে এ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার বার্তা পরিবেশন করেন।

বাদল সরকার একসময় ভেবেছিলেন প্রসেনিয়াম ও অঙ্গনমঞ্চে একসঙ্গে কাজ করবেন। সেই সময় 'সাগিনা মাহাতো' অঙ্গনমঞ্চে অভিনয়ের পাশাপাশি ১৯৭২ সালের ৩০ অক্টোবর 'এবং ইন্দ্রজিৎ' প্রসেনিয়াম মঞ্চে অভিনীত হয়। কিন্তু ১৯৭২ সালে 'স্পার্টাকুস' প্রযোজনা থেকে তিনি পাকাপাকিভাবে প্রসেনিয়াম মঞ্চের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে অঙ্গনমঞ্চে চলে আসেন। বাংলা নাটকের ভিন্ন রীতির পথচারী এই নাট্যকার ও অভিনেতাকে অঙ্গনমঞ্চ ও মুক্তমঞ্চের বাস্তব মাঠ ও অঙ্গনে টেনে আনতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন নাট্যকার ও পারিচালক বীর সেন। উল্লেখ্য, অঙ্গনমঞ্চ ও মুক্তমঞ্চে অভিনীত সব নাটকই বাংলায় তৃতীয় ধারার নাটকরূপে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৭১ সাল থেকে বিভিন্ন নাট্যসংস্থা ও নাট্যকার কর্তৃক এই ধারার অসংখ্য নাটক রচিত ও অভিনীত হয়। বাদল সরকার একে একে 'স্পার্টাকুস' (১৯৭২), 'ত্রিংশ শতাব্দী' (১৯৭৪), 'লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী' (১৯৭৪) ইত্যাদি নাটক প্রযোজনা করে থার্ড থিয়েটারে পরিবেশন করেন। 'ভোমা' (১৯৭৫) বাদল সরকার রচিত ও নির্দেশিত এবং 'শতাব্দী' নাট্যদল প্রযোজিত একটি বিখ্যাত নাটক। নাটকটি প্রথম পরিবেশিত হয় সুন্দরবনের রাঙ্গাবেলিয়া গ্রামে। ১৯৭৬ সালের ২১ মার্চ। 'শতাব্দী' নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় বাদল সরকার রচিত ও নির্দেশিত আরও কিছু উল্লেখযোগ্য নাটক হচ্ছে— 'মিছিল' (১৯৭৪), 'ভানুমতীকা খেল' (১৯৭৪) 'রূপকথার কেলেঙ্কারী' (১৯৭৪), 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস' (১৯৭৬), 'হট্টমালার ওপারে' (নাটকটি প্রেমেন্দ্র মিত্র ও লীলা মজুমদারের কিশোর উপন্যাস 'হট্টমালার দেশে' অবলম্বনে ১৯৭৭ রচিত), 'গন্ডী' (১৯৭৮) 'বাসি খবর' (১৯৭৯), 'মানুষে মানুষে' (১৯৮১), 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' (১৯৮২), 'খাট্ মাট ক্রিং' (১৯৮৩), 'জন্মভূমি আজ' (১৯৮৬), 'উদ্যোগ পর্ব' (১৯৮৭), 'চূর্ণ পৃথিবী' (১৯৮৮), 'ভুল রাস্তা' (১৯৮৯), 'শতাব্দী' (১৯৯১), ফ্রেনানডো অ্যারেবল্ এর 'পিকনিক অন দ্য ব্যাটলফিল্ড' অবলম্বনে লেখেন 'চড়ুইভাতি' (১৯৯৪) ইত্যাদি তৃতীয় ধারার নাটক রচনা ও প্রযোজনা করে এই ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। 'পথসেনা' নাট্যদল প্রযোজিত কয়েকটি নাটক হচ্ছে - 'রজনীকান্ত গল্প বলো', 'শবদর্শন', 'অগ্নিগর্ভ', 'বেহুলা', 'ছত্রপতি' ইত্যাদি। 'আয়না' নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত এমন কয়েকটি নাটক - 'নক্সীকাঁথার মাঠ', 'চক্রব্যুহ', 'সিঁড়ি', 'আলো চাই', 'ঝগড়াবৃত্তান্ত', 'কারিগর', 'তির্যক' ইত্যাদি। উপরোক্ত নাট্যদলগুলি ছাড়া আজও যাঁরা বাদল সরকার প্রবর্তিত পথ অনুসরণ করে তৃতীয় ধারার নাটক রচনা ও পরিবেশন করছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাট্যগোষ্ঠী- হালিশহর সাংস্কৃতিক সংস্থা, তিরন্দাজ, বৃহী, শতক প্রভৃতি।

সূত্রনির্দেশ :

১। ১৫ জুলাই ১৯২৫ - ১৩ মে ২০১১। ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত- ১৯৭২, সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কার - ১৯৬৮, পদ্মভূষণ - ২০১০।

২। Voyages in the Theatre : IV Shri Ram Memorial Lecture.

৩। সেখ জাহির আব্বাস, মুক্তনাটক বিষয়ে বাদল সরকারের সাক্ষাৎকার, নাট্যসৃজনী, শারদ সংখ্যা, ২০১১, পৃ. ২৮৫।

৪। শুভেন্দু সরকার, 'বাদল সরকার বিকল্প নাটক বিকল্প মঞ্চ', উত্থক প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৭।

৫। শুভময় দত্ত, 'শতাব্দীর কুয়াশা পেরিয়ে' প্রবন্ধ, নর্থস্টার, প্রথম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পৃ. ১১।

৬। দর্শন চৌধুরী, 'থার্ডথিয়েটার ও বাদল সরকার', নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, সংখ্যা - ৯, ২০০৪, পৃ. ৭১-৭২।

৭। পবিত্র সরকার, 'থার্ড থিয়েটার, ফোর্থ থিয়েটার', নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ, প্রমা প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, ২০০১, পৃ. ৬৬।

৮। সুরজিৎ ঘোষ, একদিনের জন্যেও মনে হয়নি ভুল দিকে এসে গেছি, বাদল সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, দেশ, বর্ষ ৫৯-৬০, ১৯৯২, পৃ. ৪০।

৯। Subhendu Sarkar, Badal Sarkar's "Two Plays", New Delhi, Oxford University Press, ২০১০, pp. xvi-xvii

১০। সেখ জাহির আব্বাস, 'বাংলা পথনাটকের উদ্ভব, বিকাশ এবং বিবর্তন' শীর্ষক গবেষণা সন্দর্ভ, পৃ. ১৪৩।

১১। অয়ন্তিকা ঘোষ, 'থার্ড থিয়েটার', সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার সম্পাদিত 'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন', দ্বিতীয় মুদ্রণ, রত্নাবলী, কলকাতা, পৃ. ৭৫৩।

১২। পবিত্র সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

১৩। দর্শন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

১৪। সেখ জাহির আব্বাস, প্রাগুক্ত।

১৫। বাদল সরকার 'থিয়েটারের ভাষা', প্রথম রক্তকরবী সংস্করণ, কলকাতা, ২০০২, পৃ.৩০।

১৬। Swati Bhise, Badal Sircar's Third Theatre : Feature and Functions, International Multidisciplinary Research Journal, March, 2013, pp. 4-6

১৭। সুরজিৎ ঘোষ, 'একদিনের জন্যেও মনে হয় নি ভুল দিকে এসে গেছি', বাদল সরকারের সাক্ষাৎকার, দেশ, বর্ষ ৫৯-৬০, ১৯৯২, পৃ. ৪০।

১৮। Pranab Phukan & Dr Satyakam Borthakur, Third Theatre : A Media Closer to Folk, Asian Research Consortium, Vol. 5, No. 2, February 2015, pp. 148-157

নাট্যধারার বিবর্তন : পথনাটক ও অঙ্গননাট্য

।। এক ।।

বাংলা নাট্যচর্চায় এক বৈচিত্র্যময় ধারা 'পথনাটক'। 'লোকনাট্য', 'যাত্রা'-রীতির পাশাপাশি নাট্য-অভিনয় ধারায় বাংলা পথনাটক নামক শিল্পকলা এক স্বকীয় পরিচিতি লাভ করেছে। 'মুক্তনাটক', 'ওপেন এয়ার থিয়েটার', 'ফ্রি থিয়েটার', 'বিকল্প থিয়েটার' প্রভৃতি শব্দ 'পথনাটক'-এর বাংলা প্রতিশব্দ। রাজনৈতিক মতাদর্শ, আধুনিক জটিল বিন্যস্ত জীবনের নানা সমস্যা, এর স্বরূপ উদ্ঘাটন বা বলা যেতে পারে সমাজজীবনের যেকোন ধরনের অন্যায়, অবিচার, অমানবিকতা, অসাম্য-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রদর্শন বা জনমত গঠনের এক শৈল্পক মাধ্যম 'পথনাটক'। প্রামাণ্য তথ্য মতে, বিশ শতকের তিনের দশক থেকে বাংলা 'পথনাটক' নামক অভিনয় শিল্পটির চর্চা চলছে বঙ্গদেশে।

পৃথিবীর প্রায় সবধর্মগোষ্ঠীর জনসাধারণের মধ্যে সুদূর অতীতকাল থেকে লোকউৎসবকে কেন্দ্র করে ভ্রাম্যমান অভিনয়মূলক শিল্প চলে আসছে। এগুলি 'লোকনাটক' নামে পরিচিত। এর অভিনয় কোনও মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় না। খোলা আকাশের নিচে, পথে, ঘাটে, মাঠে, যে কোন স্থানে এগুলির অভিনয়-মূলক উপস্থাপন হয়ে থাকে। 'পথনাটক' শব্দটি দুটি শব্দের ('পথ' ও 'নাটক') সম্মিলিত রূপ। সাধারণভাবে যার অর্থ দাঁড়ায় , পথে যে নাট্য অভিনয় হয়, তাই 'পথনাটক'। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'লোকনাটক' ও 'পথনাটক' বলতে একই বৈশিষ্ট্যের অভিনয়শিল্পরীতি নয়। উভয়ের মধ্যে দর্শনগত পার্থক্য বিদ্যমান।

কোনও শিল্পরীতিই আকস্মিক ভাবে সৃষ্টি হয় না, হতে পারে না। 'পথনাটক'-এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। আদিনাটক, লোকনাট্য, মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রতিবাদী রূপের প্রদর্শনগত, আঙ্গিকগত ও রবীন্দ্র ঐতিহ্য ধারার অনুবর্তনেই বাংলা পথনাটকের পথচলা শুরু হয়েছিল।[১] পথনাটকগুলিতে যেমন মিশর ও গ্রীসের কৃষিজীবী জনসাধারণকৃত 'ডায়নসীয়' পুরাণকাহিনির প্রভাবজাত অভিনয়রীতির প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়, ঠিক তেমনি সংস্কৃত নাটক ও বাংলায় প্রবহমান মুক্তনাটকের অভিনয় শৈলীর সন্নিবেশ ঘটেছে এগুলিতে। লোকনাট্যের শিষ্টাচারহীনতার রূপ, লোকআঙ্গিক ব্যবহার সহ দেশজ উপস্থাপনরীতি পথনাটককে সমৃদ্ধ করেছে। পথনাটকের বিষয়বস্তুর সিংহভাগে যে প্রতিবাদ

প্রবণতা চোখে পড়ে তা প্রাচীন লোকনাট্য ও সংস্কৃত নাটকে প্রাপ্ত, নানা সামাজিক কুপ্রথা সহ রাজনৈতিক প্রতিবাদী-চরিত্রের প্রভাবে স্নাত। লৌকিক আঙ্গিক, ধ্রুপদি মঞ্চের নাট্য-আঙ্গিক, দর্শন জাতীয় নাটকের আঙ্গিক, পাশ্চাত্য নাট্যরীতি সহ জনপ্রিয় আধুনিক নাট্যআঙ্গিকের ঐতিহ্যে পুষ্ট হয়েছে পথনাটকের আঙ্গিক। বাংলা পথনাটকে রবীন্দ্র ঐতিহ্যের প্রভাবও অনস্বীকার্য নয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কোনও পথনাটকের সন্ধান যদিও আমরা পাই না ঠিকই কিন্তু ১৯০২ সালে নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে, 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে তিনি 'আবরণহীন মঞ্চ' বা 'মুক্তমঞ্চ'-এর প্রসঙ্গে মতপ্রকাশ করে বলেছেন,— "... ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল, কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।"[২] তিনি তাঁর জীবনের শেষের দশকগুলিতে লেখা কয়েকটি নাটকে 'রক্তকরবী' (১৯২৩), 'কালের যাত্রা' (১৯৩২), 'তাসের দেশ'-এ (১৯৩৩) পথনাটকের মতো গভীর মমতায় সমাজ বিপ্লবের বিজয় কেতন উড়িয়েছেন। তাছাড়া, তিনি আবরণহীন মঞ্চে নাটককে শরীরী ভাষার মাধ্যমে ইঙ্গিতময় করে প্রকাশ করার যে চেষ্টা করেছিলেন, সেই ঐতিহ্যেরই উত্তরসূরি বাদল সরকার ও প্রবীর গুহের পথনাটক। বাদল সরকার এরই প্রভাবে ১৯৯৬ সালে 'রক্তকরবী' নাটককে সফলভাবে প্রথম প্রযোজনা করেন মুক্তাঙ্গনে। তাছাড়া, শুভঙ্কর চক্রবর্তীর 'মুসলমানী গল্প', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন' নাটক অবলম্বনে প্রবীর গুহ রচিত 'মেঘ ক্ষণিকের', বাংলাদেশে মাহমুদুল ইসলাম সেলিমের 'জুতা আবিষ্কার' কবিতা অবলম্বনে রচিত 'হবুচন্দ্র গবুচন্দ্র' ও 'বুদ্ধির ঢেঁকি' নামক পথনাটক ঐতিহ্যের প্রভাবে রবীন্দ্র সৃষ্টি নানা বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে রচিত।[৩]

।। দুই ।।

বিশ্বপ্রেক্ষিতে পথনাট্যের (পথনাটক) জন্ম ইউরোপ মহাদেশে। বিশশতকের প্রথমদিকে বিশ্বরাজনীতির জটিল আবর্তে ইউরোপ আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য থেকেই আধুনিক পথনাটকের উদ্ভব হয়েছে। পথনাট্যশিল্পী সফদর হাশমির মতে,— "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পথনাটকের আত্মপ্রকাশকে সুনিশ্চিত করে। এজন্যই পথনাটককে বিংশ শতাব্দীর অবদান বলতে হবে, যা আত্মপ্রকাশ করেছিল পুঁজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণে জর্জরিত শ্রমিক শ্রেণীর প্রয়োজনে।"[৪] পরবর্তীতে রম্যাঁ রলাঁর 'পিপলস্ থিয়েটার' তত্ত্ব, ১৯১৭ সালের 'রুশ বিপ্লব', ১৯১৯ সালে 'পলিটিক্যাল থিয়েটার' এর মাধ্যমে এবং ব্রেটল ব্রেখট, এরভিন পিস্কাটার, ফেলিক্স গাসবরো, ওয়াণ্ডার ভ্যোগল, মাইসেন প্রমুখ বিশ্বনাট্যজগতের নাট্যকর্মীর হাতধরে রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশে এইধারার নাট্যকর্ম

বিস্তার লাভ করে। "জার্মানি বহুমুখী নাট্যচর্চার ধাত্রীভূমি হলেও পথনাটক নামের আধুনিক নাট্যরীতির জন্ম বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায়। সফদর হাশমি মন্তব্য করেছেন, যে চেহারায় আমরা আজকের পথনাটিকাকে দেখতে পাচ্ছি তার সঙ্গে সরাসরি যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের সময়। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় এক নিবন্ধে বলেছেন, 'আমরা বর্তমানে যে ধরনের পথনাটিকা করি তার সূত্রপাত অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে মস্কোর সিটি স্কোয়ারে ময়ারহোল্ড প্রযোজিত মায়াকোভস্কি-র 'মিস্ট্রিব্যুফে' নাটকে। সফদর হাশমির 'পথনাটিকা' বিষ্ণু বসুর 'পথনাটক থেকে মঞ্চনাটক নির্মাণ', 'মায়াকোভস্কির মিস্ট্রি ব্যুফে', শিশির সেনের 'পথনাটক', শিব শর্মার 'পথনাটকের ঐতিহ্যগত বিকাশ ও বিভ্রান্তি', কাবেরী বসুর 'কমেডি দ্য লার্ত থেকে পথের কর্কশ থিয়েটার' প্রবন্ধগুলি থেকে জানা যায়, ভসেভোল্ড মায়ারহোল্ড অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম বর্ষ পূর্তিতে মস্কোর রেড স্কোয়ারে বিদেশি অতিথিদের সামনে কবি ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কির 'মিস্ট্রি ব্যুফে' (সমর্তপোত) নামক একটি কবিতাকে পথনাটকে রূপায়িত করে প্রথম প্রযোজনা করে। শিব শর্মা এই নাটকটি সম্পর্কে জানিয়েছেন, 'মিস্ট্রি ব্যুফে' নামক মায়ারহোল্ড যে নতুন ধারায় ও রীতিতে পরিচালনা করেন তা অতীতের গতানুগতিক ধারা থেকে ছিল ভিন্নতর এবং জনপ্রিয় লোকশিল্পের উপকরণে সমৃদ্ধ। সোভিয়েত রাশিয়ায় পথনাটকের সূচনার অনুপ্রেরণা শিল্পীরা এখান থেকেই অর্জন করেন। এই রীতির অনুপ্রণায় সোভিয়েত রাশিয়ায় যে নাট্য আন্দোলন গড়ে ওঠে তাকে বলা হয় 'এজিট প্রপ থিয়েটার'। এজিট প্রফ অর্থাৎ Agitational Propaganda- Agitation মানে আলোড়ন আর Propaganda হল সংঘবদ্ধ প্রচারকার্য। হীরেন ভট্টাচার্য এর ব্যাখ্যা মতে এজিট হল আবেগের উদ্দীপন। এজিটেশন মানুষকে সক্রিয় করে তোলে, আর প্রোপাগান্ডা হল প্রচার। তা-যুক্তি-তর্ক-প্রমাণাদির প্রয়োগে মানুষকে কোনো বিশেষ মতে বিশ্বাসী করে তোলেন। এই রীতিতে ভর করে 'মিস্ট্রি ব্যুফে' নাটকটি ছড়িয়ে পড়ে শ্রমিকদের বস্তিতে, কারখানার গেটে, বাজারে, রণাঙ্গণে, হাসপাতালে সর্বত্র। জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে এজিট প্রপ থিয়েটার দ্রুত ছড়াতে থাকে।"[৫] ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত দেশ থেকে চিনে প্রতিষ্ঠিত হয়। পথনাটকও ভীত গাড়ে সেখানে। ১৯২০ সালে লেনিন তাসখন্দে সাত সদস্যের ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন এবং ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে প্রথম সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনের ফলে চীন ও রাশিয়া কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের সঙ্গে ভারতীয় কমিউনিস্টপন্থীদের হৃদ্যতা সৃষ্টি হয় এবং 'এজিট প্রপ থিয়েটার' ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে চিনে প্রচলিত গণনাটক আমাদের দেশের যুব-ছাত্রদলের মধ্যে উদ্দীপনা সঞ্চার করে এবং গণনাট্য আন্দোলনে উদ্যোগী করে তোলে।

১৯৩৫ সালে কমিউনিস্ট মতাদর্শকে ছাত্রসমাজের কাছে প্রসার-প্রচার সহ উদ্দীপনা সঞ্চারের মানসিকতা নিয়ে 'অল ইণ্ডিয়া স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন' (All India Students Federation) সৃষ্টি হয়। ছাত্রফেডারেশনের স্থায়ীসদস্য দয়ালকুমার গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষকে প্রতিবাদী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করতে 'মুক্তির অভিযান' নামে বাংলায় প্রথম গণনাটক রচনা করেন। এই গণনাটকই পরবর্তীতে পথনাটক নামে পরিচিত হয়। সমালোচক যথার্থই বলেছেন, ''ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্রশিল্পী দয়াল কুমারের উদ্যোগে পথনাটিকার সূত্রপাত বলা যেতে পারে।'' [৮] ১৯৩৮ সালেই যে বাংলা নাট্যজগতে 'পথনাটক' বলে একটি ধারার জন্ম হয়েছিল তা শান্তিময় গুহ মহাশয়ের একটি মন্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়,— ''আমাদের দেশের এই নাট্য (পথনাটক) আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, ১৯৩৮-৩৯ সালে।... একথা মেনে নেওয়া কারও পক্ষে হয়তো কষ্টকর হবে, কারণ মুক্তাঙ্গনে নাট্যকলা প্রদর্শন আমাদের দেশে নতুন নয়। অতি প্রাচীনকাল থেকেই অন্য অনেক দেশের মতো আমাদের দেশেও নাট্যকলা প্রদর্শিত হত। প্রদর্শিত বিষয়বস্তু যাতে সকলের দৃষ্টিগোচর ও শ্রুত হয়, তারজন্য মঞ্চরূপ একধরনের উঁচু বেদীও ব্যবহৃত হত। তখনকার সমাজে এইসব স্থানই ছিল শিল্পচর্চা, গণসংযোগ ও প্রচারের ক্ষেত্র। বর্তমানেও গ্রামে, এমনকি আধুনিক শহরের উন্মুক্ত স্থানে, নানাধরনের শিল্পকলা প্রদর্শনের নজির অপ্রতুল নয়। এ থেকে কেউ যদি মনে করেন যে, পোস্টার নাটকের ধারণা এসেছে এইসব শিল্পধারা থেকে, তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে এটুকু বলা যাবে যে, শিল্প বিকাশের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভদ্রলোকের জ্ঞানের অভাব আছে।'' [৯] তাই সর্বোপরি বলা যায়, ভারতের ঐতিহ্যগত লোকনাট্য ও অভিনয় আঙ্গিকের সূত্র ধরে, মুক্তনাট্য চর্চার উর্বর ক্ষেত্রকে ভর করে এবং বিশ্বরাজনীতির অনিবার্য অভিঘাতে দয়াল কুমারের রচনা দিয়েই বাংলা 'পথনাটক' নামক এক নতুন নাট্যধারার সঙ্গে বাংলার দর্শক-শ্রোতার প্রথম পরিচয় ঘটে।

।। তিন ।।

লোকনাট্য ও পরিশীলিত নাটকের উপাদান ও বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ও ক্রমবিবর্তনেই পথনাটকের সৃষ্টি। সময়ের সাথে সাথে 'পথনাটক'-এর সংজ্ঞারও তাই পরিবর্তন লক্ষণীয়। তাছাড়া, পথনাটকের সংজ্ঞা নিরূপণেও দেখা যায় নাট্যসমালোচক, নট ও নাট্যকারদের মধ্যে মতভেদ। স্বদেশি আন্দোলনের বরিষ্ঠ নেতা বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,— ''প্রাচীনকালে আমাদের দেশে পথনাটক ছিল। তা পথে বের হতো দেবতার পূজা উৎসবের শোভাযাত্রায়। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে রাজশাসিত পথনাটক মৃগয়া বা পূজা উৎসবের ছিল বড় আকর্ষণ। উনিশ শতকে খোদ কলকাতায় যে সঙ্ বেরোতো পরব উপলক্ষ্যে, বলাবাহুল্য , তাও তো পথনাটক।'' [১০] ড. সরোজ মিত্র এর সংজ্ঞা সম্বন্ধে

বলেন— ''আমরা পথনাটক বলতে যা বুঝি তা মূলত রাজনৈতিক থিয়েটার। তার সূচনা দেখা যায় সোভিয়েত রাশিয়ায়।'' [১১] মন্ময় রায় পথনাটকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, ''পথনাটিকা রাজনৈতিক দলের শাণিত হাতিয়ার। অতি সহজে, সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে সমাজ সমস্যামূলক বা রাজনৈতিক বক্তব্য পৌঁছে দেবার একটি মাধ্যম। প্রযোজনার ব্যয় নেই বললেই চলে, পথের মধ্যেই বা ছোটো চৌকির ওপর কুড়ি থেকে এক ঘন্টা সময়সীমার মধ্যে এগুলি অভিনীত হয়।'' [১২] দর্শন চৌধুরী, 'তৃতীয় বিশ্বের থিয়েটার থার্ড থিয়েটার এবং পথনাটক' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, ''কোনো মঞ্চ নেই, সাজপোশাক নেই, মেকাপ নেই। নির্দিষ্ট স্থান নেই, যেখানে দর্শক সেটাই স্থান। প্রয়োজনে দেখবার জন্য যেটুকু আলো দরকার তাতেই অভিনয় পথের ধারে, মোড়ে, চৌরাস্তার ওপরে চলতি জনতা জমায়েত হয়। সমসাময়িক দেশীয় রাজনৈতিক ভাবনা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক ঘটনা ও ভাবনা, সমাজ দ্বন্দ্বের নানা প্রক্রিয়া , এই নাটকগুলির মাধ্যমে জনতার সামনে হাজির করা হয়। সংলাপ, গান, ঢাক, ঢোল ব্যবহৃত হয়। কিছু পোস্টার, কিছু স্লোগান, কিছু বর্ণনা ও নির্দেশ লেখা প্ল্যাকার্ড ব্যবহৃত হয়। পথনাটকে বেশি চরিত্র থাকবে না, সময়কাল বেশি হবে না, মঞ্চোপকরণ থাকবে না। থাকবে শুধু একটা নাটক, কিছু দর্শক এবং কয়েকজন অভিনেতা অভিনেত্রী। তিনি বলেন, 'পথনাটককে 'এজিট প্রপ' বলা যেতে পারে। যা কিনা একদিকে এজিটেশন, অন্যদিকে প্রোপাগান্ডা। লেনিন দুই রকমের প্রচারের কথা বলেছিলেন , প্রোপাগান্ডা এবং এজিটেশন। প্রোপাগান্ডা হলো, একটা সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের আস্থা নাড়িয়ে দেওয়া, মানুষের আস্থা জাগিয়ে তোলা। এই সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের ঘৃণা জাগ্রত করা। মানুষের মনের অনেক গভীরে কাজ করে যাওয়ার এই প্রক্রিয়াটাই হলো প্রোপাগান্ডা, আর এজিটেশন হলো, একটা তাৎক্ষণিক বিষয়ের ওপর মানুষকে সচেতন করে ক্রুদ্ধ করে তোলা; তাকে ভাবনা শুরুর প্রাথমিক স্তরে পৌঁছে দেওয়া। পথনাটকগুলি হচ্ছে এই এজিটেশনের অংশ।' দর্শন চৌধুরী 'থার্ড থিয়েটার এবং বাদল সরকার' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, 'এক সমতল, একই আলোর বৃত্তে, একই আকাশ ও ঘাসের মধ্যে জনগণের প্রচন্ড কৌতূহলের মধ্যে জনতার সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে জনগণের এই যে অভিনয় তাই তো মুক্তমঞ্চ, ফ্রি থিয়েটার।'' [১৩]

বলা যেতে পারে, পথনাটক হলো প্রোসেনিয়াম মঞ্চের বাইরে, খোলা আকাশের নিচে, বিনা রঙ্গমঞ্চে, আড়ম্বরহীন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিনা মেকাপে পথ চলতি মানুষকে জড়ো করে, তাদের সামনে, তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ, সুনিপুণ ভাবে স্বল্প সময়ে, সীমিত সংখ্যক অভিনেতা অভিনেত্রী দ্বারা প্রয়োজনে একই ব্যক্তির একাধিক ভূমিকায় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যে কোনো সময়, যে কোনো স্থানে অভিনীত, প্রত্যক্ষ রাজনীতি তো বটেই তা ছাড়া কোনো তাৎক্ষণিক-অতাৎক্ষণিক, লঘু-গুরু,

প্রচারমূলক, শিক্ষামূলক বা নান্দনিক, স্থানীয় কোনো ঘটনা থেকে আন্তর্জাতিক ঘটনা, অতীতে ঘটে যাওয়া কোনো কাহিনি যার রেশ এখনো শেষ হয়নি অথবা আশঙ্কা করা হচ্ছে এমন কোনো ঘটনা যা ভবিষ্যতে ঘটতে চলেছে, প্রভৃতি যে কোনো বিষয় যা সত্যমূলক, যা যুক্তি আবেগ, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, তির্যক সংলাপ সমন্বয়ে গঠিত, চর্চা সাপেক্ষ, শরীরী ভাষায় জীবন্ত, প্রয়োজনে লোক আঙ্গিক, বাচিক শিল্প, ইমেজ, মাইম, নৃত্য-গীত, শ্লোগান, পোস্টার, আবহসংগীত, কোরাস, বাদ্যযন্ত্র, লোকক্রীড়া দ্বারা ঋদ্ধ, সর্বজনবোধ্য সুস্পষ্ট এবং তীব্র স্বরে উচ্চারিত, ভারহীন, অকৃত্রিম, বিনা টিকিটে প্রদর্শিত, সপ্রস্তুত দর্শক মনে কৌতূহল উদ্দীপক এবং সৃজনশীল যোগ্যতায় ও দায়বদ্ধতায় উপস্থাপিত বিবর্তনশীল নাট্যকলা।

বাস্তবসমস্যা পথনাট্যের আখ্যানের বিষয় হয়ে ওঠে। এর অভিনয় কাল সংক্ষিপ্ত। দর্শক এবং অভিনেতা এক সমতলে, এক আলোকবৃত্তে অবস্থান করে উপভোগ ও অভিনয় করে। এর ভাষা সর্বজনবোধ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক। মানসিকভাবে অপ্রস্তুত পথচালিত মানুষকে আকৃষ্ট করে এধরনের নাটক। জনসাধারণকে তাৎক্ষণিক কোনও বার্তা প্রদানের পাশাপাশি এগুলির বার্তা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে দর্শকমনকে আলোড়িত করে। সীমিত অভিনেতা/অভিনেত্রী দ্বারা অভিনীত এধরনের নাটকে একজন ব্যক্তি নাট্যচরিত্রের একাধিক ভূমিকায় অভিনয় করেন। বিনা টিকিটে প্রদর্শিত এই নাটক ব্যক্তিচিন্তাকেন্দ্রিক মানসিকতার লোপ ঘটিয়ে সমষ্টিগত দৃষ্টি-শক্তি ও চিন্তা-ভাবনাকে প্রসারিত করে। শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত জনতার শ্রেণিচেতনা জাগিয়ে তোলা এধরনের নাটকের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য।

।। চার ।।

বাংলা পথনাট্য ধারার উৎপত্তি থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বিভিন্ন নট, নাট্যকার ও নাট্যসমালোচকরা পথনাটককে নানা ভাগে বিভক্ত করেছেন। কেউ কেউ দর্শনগত দিক থেকে বিচার করে, আবার কেউ বিষয়বস্তু, রচনারীতি, ব্যবস্থাপনা, আঙ্গিক ইত্যাদি দিককে আধার করে এগুলির প্রকারভেদ নির্ণয় করেছেন। গবেষক সেখ জাহির আব্বাস পথনাটকের দশটি প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হলো , দর্শনগত, রচনাগত, বিষয়বস্তুগত, আঙ্গিকগত, ব্যবস্থাপনাগত, দর্শক-অভিনেতা সম্পর্কগত, উপকরণগত, অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংখ্যাগত, সময়গত ও পোশাকগত পথনাটক। তবে আমাদের বিচারে রূপ ও বৈচিত্র্য অনুযায়ী পথনাটকের মূল প্রকার পাঁচটি। সেগুলি হলো— রচনাগত, দর্শনগত, বিষয়বস্তুগত, আঙ্গিকগত ও ব্যবস্থাপনাগত। রচনাগত পথনাটক আবার তিনটি উপপর্যায়ে বিভক্ত (ক) মৌলিক পথনাটক যেমন, উৎপল

দত্তের 'সমাজতান্ত্রিক চাল' (১৯৬৫), ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 'খুনির সন্ধানে' (১৯৮০), গৌতম রায়চৌধুরীর 'তিরিশে জানুয়ারি' (১৯৯৮) ইত্যাদি, (খ) অনূদিত পথনাটক। আমেরিকান নাট্যকার এডওয়ার্ড মাস্টের 'সামাটা' গল্প অবলম্বনে চন্দন সেন-এর 'ইতিহাস জাগছে' এবং (গ) রূপান্তরিত পথ নাটক। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'তোতাকাহিনি' অবলম্বনে অভিজিৎ সরকারের 'এক যে ছিল পাখি', 'বিসর্জন' নাটক অবলম্বনে প্রবীর গুহের 'মেঘ ক্ষণিকের' (২০০৯) ইত্যাদি।

দর্শনগত দিকের পথনাটকের আবার মূলত দু'টি বিভাগ। একটি হলো, সংঘবদ্ধ প্রচারকার্য (প্রোপগাণ্ডামূলক) পথনাটক। যেমন, পানু পালের 'ভোটের ভেট' (১৯৫২), শিবশর্মার 'হাত' (১৯৮৯) ইত্যাদি এবং অন্যটি হলো অপ্রোপগাণ্ডামূলক পথ নাটক। যেমন, সঞ্জল গাঙ্গুলীর 'ইট ভাটার গান' (১৯৯৪-৯৫), সর্বশিক্ষা-১ (২০০৮), শতাব্দী নাট্যদল প্রয়োজিত 'ওরে বিহঙ্গ' ইত্যাদি।

রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক নামে বিষয়বস্তুগত দিক থেকে পথনাটকের দু'টি উপরিভাগ। উৎপল দত্তের 'দিনবদলের পালা' (১৯৬৭), রানা সরকারের 'ওম্ শান্তি ওম্' ইত্যাদি রাজনৈতিক পথনাটকের পাশাপাশি তাৎক্ষণিক বিষয়কে কেন্দ্র করেও অরাজনৈতিক নানা পথনাটকের পরিচয় আমরা পাই। যেমন, হিন্দ মোটর কারখানার শ্রমিকদের উপর পুলিশের অত্যাচারের ঘটনা নিয়ে উৎপল দত্তের 'স্পেশাল ট্রেন' (১৯৬২), সিঙুরের রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় রচিত অমল রায়ের 'সিঙুরের গুড়' (২০০৬), নন্দীগ্রামের গণহত্যার প্রতিবাদে রচিত অচিন্ত্য বিশ্বাসের 'অন্যদিন' ইত্যাদি। পোস্টার, কোলাজধর্মী, গল্পধর্মী, কাব্যধর্মী, এপিকধর্মী, মুকাভিনয়ধর্মী, থার্ড-থিয়েটাররীতিধর্মী, ফোরাম থিয়েটারধর্মী আঙ্গিককে কেন্দ্র করে রচিত বাংলা পথনাটকের সংখ্যা নগণ্য নয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল, উৎপল দত্তের 'নয়া তুঘলক', শিবশর্মার 'বুড়ো আঙুল', বাদল সরকারের 'লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী', রণেন চক্রবর্তীর 'ঘুষ', বাদল সরকারের 'মিছিল', ইত্যাদি। ব্যবস্থাপনাগত পথনাটককে অনুদাননির্ভর ও প্রাণের তাগিদে নির্মিত, এই দু'টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। অনুদাননির্ভর পথনাটক কোন প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল কিংবা সরকার প্রদত্ত অনুদানের সাহায্যে রচিত ও প্রযোজিত হয়। এরকম কয়েকটি পথনাটক হল, ২০০৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের সময় প্রদীপ চক্রবর্তীর 'নো-এন্ট্রি', সৌরভগুপ্তের 'মর্ত্যে মহাদেহ', শিব শর্মার 'তেনার দেখা নাইরে' ইত্যাদি। অন্যদিকে প্রাণের তাগিদে নির্মিত কিছু পথনাটক আয়না নাটদলের '১৮০ বর্গমাইল', 'বাঘ', অলোকদেবের 'মে দিবসের মা', গৌতম রায় চৌধুরীর '৩০শে জানুয়ারি' ইত্যাদি পথনাটক।

।। পাঁচ ।।

রচনা, প্রযোজনা ও অভিনয় রীতির বিচারে মঞ্চনাটক, লোকনাটক, যাত্রা, পোস্টার নাটক থেকে পথনাটকের স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। মঞ্চনাটক (পূর্ণাঙ্গনাটক ও একাঙ্কনাটক)-এর পরিবেশনা প্রেক্ষাগৃহনির্ভর এবং এগুলি সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত ও রুচিশীল নাট্যানুরাগী দর্শকের নাটক। তাছাড়া একাঙ্ক মঞ্চনাটক দর্শকচিত্তে উত্তেজনা হ্রাস করে। এই ধরনের নাটকে চরিত্রের ভূমিকা সর্বাধিক। অন্যদিকে, পথনাটক প্রেক্ষাগৃহ নির্ভর নয়। সাধারণ মানুষ এর দর্শক-শ্রোতা। বিষয়বস্তুর প্রাধান্যই পথনাটকের মূল।

লোকনাট্য ও পথনাটক উভয় নাট্যধারাই ভ্রাম্যমান ও পথেরধারের সাধারণ দর্শক-শ্রোতার অভিনয় শিল্প হলেও বিষয়বস্তুর দিকে পথনাটক অর্বাচীন কালের আধুনিক বাস্তববাদী নাট্যশিল্প। সমকালীন সমাজব্যবস্থার কলুষিত নানা অর্ন্তদ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে এই শিল্পকলা। লোকনাট্যগুলির বিষয়বস্তু যেখানে অনমনীয় পথনাটক সেখানে বিবর্তনশীল ধারা।

যাত্রা থেকে পথনাটক অনেকবেশি কৃত্রিমতামুক্ত। পথনাটকে যাত্রার মতো নৃত্য ও গীতের আধিক্য নেই। যাত্রা দীর্ঘ সময়ের অভিনয়শিল্প। পক্ষান্তরে পথনাটকের অভিনয় সংক্ষিপ্ত সময়ে হয়ে থাকে। যাত্রার মত পথনাটক গল্প প্রধান নয়। ছোটোছোটো কাহিনি ও তথ্যভিত্তিক সংলাপে পথনাটকের সৃষ্টি।

পোস্টার নাটকের সঙ্গে পথনাটকের তফাত খুবই স্বল্প। পোস্টার নাটক 'পোস্টার'-এর মতো সংক্ষেপে, সহজে লেখা থাকে। বাস, ট্রেন, ট্রাম-এর যাত্রাপথে খুব দ্রুত এ ধরনের নাটক অভিনীত হয়। এ ধরনের নাটকে মূলত পোস্টার, ব্যানারের সাহায্যে বক্তব্য তুলে ধরা হয়। তথ্য ও বক্তব্যের তীক্ষ্নতা পোস্টার নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

।। ছয় ।।

১৯৩৮ সালে এডগার স্নোর এর 'রেড স্টার ওভার চায়না' নাটকের প্রভাবে লেখা দয়ালকুমার-এর 'মুক্তির অভিযান' থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত বহমান বাংলা পথনাটকের সময় সীমাকে বৈশিষ্ট্যের বিচারে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। সেগুলি হল —

(ক) আদিপর্বের বাংলা পথনাটক (১৯৩৮-১৯৫০ খ্রিঃ)

(খ) বিকাশ ও বৈচিত্র্য পর্বের পথনাটক (১৯৫০-২০০০ খ্রিঃ)

(গ) নব উদ্যম পর্বের পথনাটক (২০০০ পরবর্তী)

'মুক্তির অভিযান' ছাড়াও আদিপর্বের বাংলা পথনাটকের ইতিহাসে যে সমস্ত নাট্যকার ও তাঁদের নাটকের আমরা পরিচয় পাই এর কয়েকটি এরূপ— দয়াল ঠাকুরের

'আলোর পথে' (১৯৩৮), প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের 'চিঠি', সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'জাপানকে রুখতে হবে' (১৯৪২), বনস্পতি গুপ্তের 'দেশরক্ষার ডাক' (১৯৪২) প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। তাছাড়া কল্পতরু সেনগুপ্তের 'পতেঙ্গার প্রতিশোধ' (১৯৪২), সুবোধ ঘোষের 'কর্ণফুলির ডাক', দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভিমান' (১৯৪৩), প্রভাতকুমার গোস্বামীর 'একরাত্রি', কল্পতরু সেনগুপ্তের 'শিক্ষা বাঁচাও' (১৯৪৫), সজল রায় চৌধুরীর 'নয়নপুর' (১৯৪৮), 'পনরই অগাষ্টের পর', সলীল চৌধুরীর 'সংকেত' (১৯৪৯), ইত্যাদি নামে অসংখ্য পথনাটক রচিত ও অভিনীত হয়।

১৯৪৯-৫১ সাল পথনাট্য চর্চার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ বছর। এই সময়সীমার মধ্যে একদিকে যেমন কমিউনিস্ট নেতাদের মুক্তির দাবিতে পথনাটক রচিত হয়েছে, ঠিক তেমনি ১৯৫১ সালে গণনাট্যসংঘের প্রথম পথনাটক স্কোয়াড্ গঠিত হয়েছিল পানুপালের নেতৃত্বে। এই পর্বে অসংখ্য নাট্যকার অভিনেতার আবির্ভাব ঘটে। এর মধ্যে কয়েকজন নাট্যকার ও তাঁদের রচিত নাটক হল— উমানন্দ ভট্টাচার্যের 'চার্জশীট', পানুপালের 'ভোটের ভেট', উৎপল পালের 'পাসপোর্ট', সুনীল দত্তের 'রক্তে বোনা ধান', শিব শর্মার 'অবরুদ্ধ ঝড়', চিত্তরঞ্জন দাসের 'বয়কট', ঘর্মদাস ঘটকের 'মোহভঙ্গ', বাদল সরকারের 'চড়ুইভাতি', 'দ্বৈরথ', সঞ্জয় গাঙ্গুলীর 'আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে', প্রবীর গুহের 'অসমাপ্ত সংলাপ', 'মৃত্যু সংবাদ' ইত্যাদি।

একবিংশ শতকের প্রথম দুই দশকে যাকে 'নবোদ্যম পর্ব' নামে অভিহিত করেছি, এই পর্বের কয়েকটি নাটক হল— ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কৌন বনেগা দেশপতি' (২০০০), আয়না নাট্যদল প্রয়োজিত 'কারিগর', প্রবীর গুহের 'বিষাদক্ষণ' (২০০৯), অচিন্ত্য বিশ্বাসের 'বিজয় উৎসব' (২০০৭), 'নন্দীগ্রাম' (২০০৭), অর্পিতা ঘোষের 'সহজ প্রশ্নের বর্ণমালা' (২০০৮) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাংলা পথনাটক প্রযোজনার সঙ্গে অসংখ্য ব্যক্তিত্বের নাম জড়িয়ে আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন, পানুপাল, মুনীর চৌধুরী, উৎপল দত্ত, হীরেন ভট্টাচার্য, রাধারমণ ঘোষ,বাদল সরকার, গৌতম সেনগুপ্ত, জোছন দস্তিদার, দিব্যেশ লাহিড়ী, শুভঙ্কর চক্রবর্তী, অমল রায়, মনোজ মিত্র, সঞ্জয় গাঙ্গুলী, তপন দাস, সদফর হাশমি, শিবশর্মা প্রমুখ।

।। সাত ।।

পথনাট্যধারার একটি ফর্ম হচ্ছে 'অঙ্গননাট্য'। এটি 'থার্ড থিয়েটার' নাট্যদর্শনের একটি বিশেষ উপস্থাপন-রীতি। মহেন্দ্রলাল সরকার ওরফে বাদল সরকার বাংলা 'অঙ্গননাট্য' থিয়েটারের প্রবক্তা। যাকে ইংরাজিতে 'এরিনা ফর্ম'-এর নাটক বলা হয়ে থাকে। আঙ্গিকের বিচারে পথনাটকের একটি রূপ হলো , গণনাট্য তথা উৎপল দত্তের দ্বারা চর্চিত

'বক্তৃতা মঞ্চের পথনাটক' আর দ্বিতীয়টি হল বাদল সরকারের 'এরিনা ফর্ম' বা অঙ্গন মঞ্চের পথনাটক।

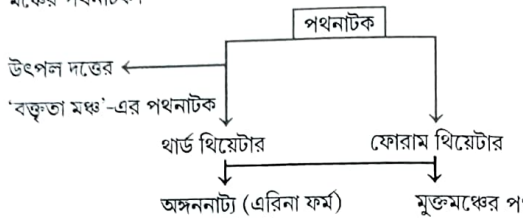

বাদল সরকার নাট্যকার ও অভিনেতা হিসেবে প্রথমত প্রসেনিয়াম মঞ্চের শিল্পী ছিলেন। পরে ১৯৭১ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত জহরলাল নেহেরু ফেলোশিপের সহায়তায় প্রসেনিয়াম বিদ্বেষী রিচার্ড শেখনারের সঙ্গে কাজ সহ নানা বৈদেশিক অভিনয়রীতির সঙ্গে পরিচয়ের ফলস্বরূপ তিনি বাংলায় প্রসেনিয়াম ভাঙার কাজকর্ম শুরু করেন।

১৯৭২ সালের ২৪শে অক্টোবর তারিখে মধ্য কলকাতার গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ-এর এবিটিএ হলে তাঁর প্রথম প্রসেনিয়াম ভাঙা অভিনয় হল গৌরকিশোর ঘোষ এর বড়গল্প 'সাগিনা মাহাতো'র নাট্যরূপ দিয়ে। তাঁর আগের নাটকাবলি থেকে 'সাগিনা মাহতো'র তফাত এইখানে যে এতে অঙ্ক আর দৃশ্যের ভাগ রইল না। সময়ক্রম ভেঙে দেওয়া হল, স্থানমাত্রাও সীমাবদ্ধ রাখলেন না তিনি। একইসঙ্গে একই অভিনয়ক্ষেত্রে নানা জায়গা বোঝানো হল। এতে জোর দেওয়া হল দলগত অভিনয়, মুখাভিনয়, ছন্দোবদ্ধ গতিভঙ্গি, গান আর নাচের উপর। তাতে উচ্চারিত ভাষার গুরুত্ব অনেক কমিয়ে আনা গেল। সেট্ বলতে বোঝাল কতকগুলি সহজে তৈরি আর বহন করার মতো দু'তিন জায়গায় ছড়িয়ে রাখা নিচু বাক্স জাতীয় প্ল্যাটফর্ম।

চেয়ারগুলিকে তাঁরা হলের মাঝখান থেকে সরিয়ে নিলেন। কিছু রাখলেন স্টেজের উপর। চারপাশে দর্শকদের বসবার জায়গা হল। মাঝখানটা হয়ে গেল ফাঁকা অভিনয়ের জায়গা, তবে দর্শকদের বসবার আশেপাশেও প্রচুর জায়গা ছিল। ফলে অভিনেতারা শুধু মাঝখানে একটা খোলা জায়গায় অভিনয় করছেন তা নয়, তাঁরা দর্শকদের পাশে বা পেছন দিয়েও চলাফেরা করে অভিনয় ক্ষেত্রকে অনেকটা বিস্তারিত করে নিলেন। দর্শকরা হয়ে উঠলেন কিছুটা অভিনয়ের অন্তর্গত। এখান থেকেই আরম্ভ হল 'অঙ্গনমঞ্চের' অভিনয়। অঙ্গনমঞ্চ বাদল সরকার প্রবর্তিত থার্ড থিয়েটারের এক বিশেষরূপ। আর একটি রূপ হল 'মুক্তমঞ্চ'। বাদল সরকারের কথায় , ''অঙ্গনমঞ্চের রূপটি হলো একটি ঘনিষ্ঠ থিয়েটারের, যেখানে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক দর্শক অভিনেতাদের খুব কাছে আছে, একই দলে আছে, একই আলোয় আছে, যেখানে দর্শকদের সামনে ছাড়াও পাশে পিছনে যাওয়া

যাচ্ছে, দর্শকদের চোখে চোখ রেখে একান্তে কথা বলা যাচ্ছে, দর্শকদের ধরা ছোঁয়ার আওতার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।''[১২]

বাদল সরকারের লেখা উল্লেখযোগ্য অঙ্গনমঞ্চের (এরিনা ফর্ম) নাটকগুলি হল, ১৯৭৪ সালে লেখা 'মিছিল', 'ভানুমতী কা খেল', 'লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী', প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাহিনি অবলম্বনে 'রূপকথার কেলেঙ্কারী', ১৯৭৫ সালে লেখা 'ভোমা', ১৯৭৬ সালে 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস', ১৯৭৭ সালে লিখিত প্রেমেন্দ্র মিত্র ও লীলা মজুমদার রচিত কাহিনি অবলম্বনে 'হট্টমালার ওপারে' ও ব্রেখেট্ অবলম্বনে 'গন্ডী', ১৯৭৮ সালে 'বাসি খবর', ১৯৮১ সালে 'ভানুমতীর খেলা', ১৯৮২ তে 'খাট্ মাট্ ক্রিং', ১৯৮৪ তে 'সিঁড়ি', ১৯৮৬ সালে লিখিত 'সাদাকালা', এছাড়া Howard Fast অবলম্বনে 'স্পার্টাকুস', 'ভুলরাস্তা', 'চড়ুইভাতি' ইত্যাদি। তাছাড়া তিনি 'এবং ইন্দজিৎ' ও 'আবু হোসেন' নাটককেও এরিনার্ফমে রূপান্তরিত করে অঙ্গনমঞ্চে অভিনয় করান।

সূত্রনির্দেশ :

১। সেখ জাহির আব্বাস, 'বাংলা পথনাটকের উদ্ভব, বিকাশ এবং বিবর্তন' শীর্ষক গবেষণা সন্দর্ভ, পৃ. ৩৮।
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রঙ্গমঞ্চ', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৭০, পৃ. ৪৫০।
৩। সেখ জাহির আব্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।
৪। সেখ জাহির আব্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।
৫। সেখ জাহির আব্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।
৬। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পথনাটক উদ্ভব ও বিকাশ', জাগো জেগে থাকা জাগানো সফদর ৫০', পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, জেলা সম্পাদক মণ্ডলী (সম্পা) প্রথম প্রকাশ, কলকতা, ২০০৬, পৃ. ১৪।
৭। শান্তিময় গুহ, 'পথনাটক আজকের ভাবনা' গণনাট্য, ৪১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ৮৩।
৮। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পথনাটকের কথা', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, মোম, ১৯৮৭, মুখবন্ধ।
৯। সফদর হাশমি, 'পথনাটক একটি পৃথক ঐতিহ্য' গ্রুপ থিয়েটার, পৃ. ৫০৭ (জনসত্তা-র ক্রোড়পত্র, জানুয়ারি, ১৯৮৯)।
১০। মন্মথ রাথ, 'গ্রুপ থিয়েটার' (৯ বর্ষ, ২ সংখ্যা) ১৯৮৬-৮৭, পৃ. ১৪৯।
১১। সৌমিত্র বসু, 'পথনাটক রবীন্দ্রনাথ কিছু ভাবনা', পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, পৃ. ৪০।
১২। বাদল সরকার, থিয়েটারের ভাষা, কলকাতা, ১৯৭২-৭৩, পৃ. ৪৮।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা

- আহমদ ওয়াকিল, লৌকিক জ্ঞান কোষ, গতিধারা, ঢাকা, বাংলাদেশ ২০১১।
- আব্বস সেখ জাহির, নাট্যসৃজনী, শারদ সংখ্যা ২০১১।
- করণ সুধীর কুমার, সীমান্ত বাংলার লোকযান, প্রথম আকাশদীপ সংস্করণ, ২০১৩।
- গোস্বামী দিলীপ কুমার, সীমান্ত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি, পারিজাত প্রকাশনী, পুরুলিয়া, ২০১৪।
- গোস্বামী করুণাময়, বাঙালির গান, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, ১৪১৯।
- ঘোষ অজিত কুমার, নাটকের কথা, সাহিত্যলোক, তৃতীয় সংস্করণ, মাঘ, ১৩৯২।
- ঘোষ ড. অজিত কুমার, নাট্যতত্ত্ব ও নাটমঞ্চ, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ ২০১০, কলকাতা।
- ঘোষ সুরজিৎ, একদিনের জন্যেও মনে হয়নি ভুল দিকে এসে গেছি, ১৯৯২।
- ঘোষ অয়ন্তিকা, থার্ড থিয়েটার, প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, ড. গিরি সত্যবতী ও ড. মজুমদার সমরেশ (সম্পা) দ্বিতীয় মুদ্রণ; কলকাতা, রত্নাবলী।
- ঘোষ ড. অজিত কুমার, যাত্রা সেকাল ও একাল, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা - ১৪০১।
- চৌধুরী দুলাল (সম্পা), বাংলা লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অফ ফোকলোর, পুস্তক-বিপনি, কলকাতা, ২০০৪।
- চক্রবর্তী হরিপদ, মধুপর্ণী, মালদহ জেলা সংখ্যা, ১৩৯২।
- চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা, সাহিত্যম, কলকাতা, ২০০৭।
- চক্রবর্তী ড. বরুণকুমার (সম্পা), বঙ্গীয় লোকসংস্কতিকোষ, অর্পণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা।
- চৌধুরী দর্শন, থার্ড থিয়েটার ও বাদল সরকার, ২০০৪।
- চক্রবর্তী শ্যামাপ্রসাদ, বর্ধমান সম্মিলনী সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা, কলকাতা।
- চট্টোপাধ্যায় সঞ্জীবচন্দ্র, যাত্রার ইতিবৃত্ত, বঙ্গদর্শন, ১৮৮৩।
- দাস কল্যাণকুমার, মধ্যবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, মুর্শিদাবাদ, ২০১১।
- দাস ধ্রুব, ভারতের লোকনাট্য, প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৯২।
- দাস বেলা ও চৌধুরী বিশ্বতোষ (সম্পা), বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি, অর্পণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০১৩।
- দেব চিত্তরঞ্জন, পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ, ফার্মা, কলকাতা, ১৯৯৪।

- দত্ত শুভময়, শতাব্দীর কুয়াশা পেরিয়ে; নর্থস্টার, প্রথমবর্ষ, ১০ম সংখ্যা।
- ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী, ১৩৯৯ বাংলা।
- পালিত হরিদাস, আদ্যের গম্ভীরা, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ ১৩১৯।
- বসু নগেন্দ্রনাথ, বিশ্বকোষ, নবমভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৮।
- বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ, আলকাপ উৎপত্তি থেকে সম্প্রতি, গণনাট্য, বত্রিশবর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৯৬।
- বর্ধন মণি, বাংলা লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ, ২০০৪।
- ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৯৮২।
- ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খন্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৬৫।
- ভৌমিক নির্মলেন্দু, জনজীবন, সংহত গোষ্ঠী ও বাঙলার লোকনাট্য, লোকশ্রুতি' ১৯৮৬।
- ভট্টাচার্য ড. গৌরীশঙ্কর, বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২।
- ভট্টাচার্য মুকুন্দদাস, বরাক উপত্যকার লোকনৃত্য ও গ্রামীণ নৃত্যকলা, প্রাসঙ্গিক প্রিন্টার্স, ১৯৯৫ ইংরাজি, শিলচর, ১৯৯৫।
- ভট্টাচার্য মিহির (সম্পা), লোকশ্রুতি, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র, ১৯৯৯।
- ভট্টাচার্য ড. সাধনকুমার, নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা, করুণা প্রকাশনী, ২০১০।
- ভট্টাচার্য ড. হংসনারায়ণ, যাত্রাগানে মতিলাল ও তার সম্প্রদায়, কলকাতা।
- ভট্টাচার্য ড. হংসনারায়ণ, যাত্রাগানের গোড়ার কথা, নাট্যলোক, ১ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ১৩৭৩।
- ভট্টাচার্য ড. আশুতোষ, যাত্রা- লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৪০১।
- মিত্র সনৎকুমার (সম্পা), বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক-পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০০।
- মুখোপাধ্যায় দুর্গাশঙ্কর, নাট্যতত্ত্ব বিচার, মর্ডান বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৩৯৯।
- মজুমদার শিশির, উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য ও পশ্চিম দিনাজপুরের খনগান ত্রিবৃত্ত, উত্তরবঙ্গ সংখ্যা, ১৯৭৮।
- মিত্র রাজেশ্বর, ছত্রাক, নবমবর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।
- মিত্র স্বপন, লোকশিল্পী রাশিনা, কলকাতা।
- মিত্র রাজেন্দ্র, বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাঘ, ১৮৫৯, কলকাতা।
- মুখোপাধ্যায় দেবযানী, পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে ও বাংলা যাত্রা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৪১৩।
- রায় মোহিত (সম্পা), নদীয়া কাহিনী পুস্তক বিপণি, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬।
- সরকার পবিত্র, নাট্যরূপ নাট্যমঞ্চ, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, ২০০১।
- সরকার সুভেন্দু, বাদল সরকার : বিকল্প নাটক, বিকল্প মঞ্চ, উত্থক প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৭।

- সেন সুকুমার, নট-নাট্য-নাটক, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৯১।
- সেন সুকুমার, চর্যাগীত পদাবলী, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০।
- সিরাজ সৈয়দ মুস্তাফা, মুসলিম চিত্রকলার আদিপর্ব ও অন্যান্য, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৪০০।
- সিদ্দিকী আশরাফ, লোকসাহিত্য (দ্বিতীয় খন্ড) গতিধারা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০৮।
- সরকার স্বরোচিষ, লোকনাট্য ও গাজির গান, শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্য ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা, ২য় সংখ্যা, ২০০৫।
- Ahmed Mohiuddin - Jarigan (Muslim Epic song of Bangladesh) United Pren Ltd., Dhaka, 1997.
- Claus, Peterj, South Asian Folklore and Encyclopedia, 2003.
- ঈক্ষণ, বইমেলা সংখ্যা, ২০০১।
- Asian Research Consortum, vol. 5, 2015.
- International Multidisciplinary Research Journal.

রমাকান্ত দাস

জন্ম- মার্চ ১৯৭৫। আসামের করিমগঞ্জ জেলার ফাকুয়াগ্রামে। পড়াশুনা- ফাকুয়াগ্রাম হাইস্কুল (মাধ্যমিক), জফরগড় এক্সটেন্ডেড হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল (উচ্চতর মাধ্যমিক), করিমগঞ্জ কলেজ (স্নাতক), আসাম বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলায় এম.এ, এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি) এবং করিমগঞ্জ আইন কলেজ (আইনে স্নাতক)। চাকুরি জীবনের শুরু ১৯৯৯ সালে নিলামবাজার কলেজের বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে। ২০০১ সালে রাধামাধব কলেজের বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান। ২০০৯ সাল থেকে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিপন্ন ভাষাগোষ্ঠী, পাণ্ডুলিপি চর্চা ও লোকসংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র' (বাংলা বিভাগ) এ সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। প্রকাশিত গ্রন্থ - বরাক উপত্যকার স্থাননাম, বরাক উপত্যকার স্থাননাম কোশ, বরাক উপত্যকার লোককথা ঃ অবয়ববাদী পাঠ, বরাক উপত্যকার কৈবর্ত সমাজে প্রচলিত মেয়েলি গীত, বরাক উপত্যকার লোকঐতিহ্য (যুগ্মভাবে) অনুবাদতত্ত্ব ও গণজ্ঞাপনবিদ্যা (যুগ্মভাবে)। এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও গবেষণা পত্রের সংখ্যা ৫০।

অনির্বাণ দত্ত

জন্ম ১৯৭৯ সালে বর্তমান আসাম রাজ্যের করিমগঞ্জ জিলাধীন বারইগ্রামের দত্তপাড়া গ্রামে। ১৯৯৪ সালে জফরগড় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক ও ১৯৯৬ সালে এই বিদ্যালয় থেকেই উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ। ১৯৯৯ সালে গুরুচরণ কলেজ, শিলচর থেকে স্নাতক। ২০০১ সালে বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় শিলচর থেকে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য' নিয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ। ২০০৮ সালে পাথারকান্দি কলেজ অফ এডুকেশন থেকে বি.এড.। ২০১০ সালে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'শিক্ষাবিদ্যা'-য় স্নাতকোত্তর। ২০১৪ সালে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন অনুযদ' অধীনস্থ বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ। বর্তমানে নিলামবাজার কলেজে বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ 'বিয়ের গীতের সমাজতত্ত্ব', 'বরাক উপত্যকার মুসলিম সমাজের বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান ও গীত', 'অনুবাদতত্ত্ব ও গণজ্ঞাপনবিদ্যা' (যুগ্মভাবে)। তাছাড়া, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থে ছাপা প্রবন্ধের সংখ্যা ২০।

ISBN-978-93-5437-469-2

9789354374692

ক্রি

ক্রিয়েটিভ পাবলিকেশন

৩৯এ, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯